হযরত ইউসুফ আ.

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

আল কুরআনুল কারীম কোন ইতিহাস গ্রন্থ কিংবা কোন কিসসা কাহিনীর কিতাব নয়। এটি তো কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষদের জন্য হেদায়াতের আলোকবর্তিকা। মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার দিক নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে এতে। পূর্ববর্তী উম্মতদের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে যাতে পরবর্তীরা এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এখন কেউ যদি শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ইতিহাস আর গল্প হিসাবে এই কিতাব অধ্যায়ন করে তাহলে কুরআন তার জন্য পথপ্রদর্শক নয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ ﴿٧﴾ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ
وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠

তরজমাঃ “ইউসুফ আ. ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে জিজ্ঞাসুদের জন্য; যখন তারা বললোঃ- অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল। নিশ্চয় আমাদের পিতা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে রয়েছেন। হয়তো ইউসুফকে হত্যা কর কিংবা তাকে ফেলে রেখে আস অন্য কোন স্থানে। তাহলে তোমাদের পিতার স্নেহ দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা (তওবা করে) ভাল মানুষ হয়ে যাবে। তাদের মধ্য থেকে একজন বললো- তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং যদি তোমরা কিছু করতেই চাও, তাহলে তাকে কোন কূপের গভীরে নিক্ষেপ কর, যাতে কোন পথিক তাকে তুলে নিয়ে যায়।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াত: ৭-১০)

তাফসীরঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ আ. ও তাঁর ভাইদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ইউসুফসহ হযরত ইয়াকূব আ.-এর বারজন পুত্র সন্তান ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেরই অনেক সন্তান- সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে।

হযরত ইয়াকূব আ.-এর উপাধি ছিল ইসরাঈল। তাই সেই বারটি পরিবার সবাই ‘বনী ইসরাঈল’ নামে খ্যাত হয়।

বার পুত্রের মধ্যে দশজন জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত ইয়াকূব আ.-এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যানের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াকূব আ. লাইয়্যার ভগিনী রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দুই ছেলে ইউসুফ ও বিনয়ামীন জন্মগ্রহণ করেন।

তাই হযরত ইউসুফ আ.-এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বিনয়ামীন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাত্রেয় ভাই। এরপর ইউসুফ আ.- এর জননী রাহীলও বিনয়ামীন- এর জন্মের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন। (আল-জামি‘লি আহকামিল কুরআন লিল কুরতুবী)

হযরত ইউসুফ আ. শৈশবে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র তাকে সিজদা করছে। এই অভিনব স্বপ্ন দেখে পিতার নিকট ব্যক্ত করলে তিনি নবী সুলভ দূরদর্শিতা দ্বারা বুঝতে পারলেন যে, ইউসুফের জন্য ভবিষ্যতে মহা মর্যাদা

অপেক্ষা করছে। এমনকি সে নবীও হতে পারে। তাই তিনি তাকে আরো অধিক স্নেহ করতে লাগলেন এবং তার এই সৌভাগ্যের সংবাদ অবহিত হয়ে অন্যান্য ভায়েরা তার প্রতি আরো ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতে পারে এবং তাকে কষ্ট দেয়ার পরিকল্পনা করতে পারে। তাই তিনি ইউসুফকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, তোমার ভাইদের নিকট এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত মোটেও বর্ণনা কর না, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে। কেননা শয়তান তো মানুষের চিরশত্রু সে চায় না ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্ক থাকুক, শান্তিতে বসবাস করুক। কিন্তু মানুষ যেটা আশঙ্কা করে সেটাই হয়ে থাকে।

হযরত ইউসুফ আ.-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা দেখলো যে, পিতা ইয়াকূব আ. ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মুহাব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনরূপে ইউসুফ আ.- এর স্বপ্নের বিষয়ও অবগত হয়েছিল, যদ্দরুন তারা হযরত ইউসুফ আ.- এর বিরাট মাহাত্ম্যর কথা টের পেয়ে তাঁর প্রতি হিংসা পরায়ণ হয়ে উঠলো।

তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো যে, আব্বাজান দেখি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বিনয়ামীনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ আমরা দশজন তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারনে গৃহের কাজ-কর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালির কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হলো- বিষয়টি অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে

অধিক মুহাব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই এসো- আমরা হয় ইউসুফকে হত্যা করি, না হয় তাকে এমন দূরদেশে নির্বাসিত করি, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

পরামর্শের এক পর্যায়ে তাদের একজন এ মত প্রকাশ করলো যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। অন্য একজন বললো- তাকে হত্যা না করে কোন দূরদেশে ফেলে আসা হোক। এতে করে মাঝখান থেকে এ কণ্টক দূর হয়ে যাবে এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ আমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তাকে হত্যা কিংবা দেশান্তরের কারনে যে গুনাহ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তাওবা করে আমরা ভালো হয়ে যাবো। শিরোনামে উল্লিখিত ‘এবং তারপর ভালো হয়ে যাবো’ বাক্যের এক অর্থ তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর আমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা, তখন পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং মনোযোগ আমাদের দিকেই নিবদ্ধ হবে এবং আমরা ভালো পরিগণিত হবো।

সেই মুহূর্তে তাদের মধ্যেরই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বললো- ইউসুফকে হত্যা করা উচিত হবে না। বরং যদি কিছু করতেই হয়, তবে তাকে কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ করা হোক, যেখানে সে জীবিত থাকবে এবং পথিকরা যখন কূপে

আসবে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং চিন্তা করতে হবে না। বরং এমতাবস্থায় কোন পথিকই তাকে দূরদেশে নিয়ে চলে যাবে।

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিলো তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবিল ছিলো জ্যেষ্ঠ। সে-ই এ অভিমত ব্যক্ত করেছিলো। এ ব্যাক্তি সম্পর্কেই সামনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ আ.- এর ছোট ভাই বিনয়ামীনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিলো- আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কীভাবে মুখ দেখাবো? তাই আমি আর কেনানে ফিরে যাবো না।

হযরত ইউসুফ আ.- এর ভাইয়েরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিতার কাছে এভাবে আবেদন পেশ করলো যে, আব্বাজান! ব্যাপার কী! আপনি দেখি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা রাখেন না! অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের

সাথে ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সেও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব।

তাদের এ আবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বেও তারা কোন সময় এ ধরনের আবেদন করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। যদ্দরুন এবার কিঞ্চিত জোর ও পীড়াপীড়ি সহকারে পিতাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে তাদের এ আবেদন সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾

“তারা বললো- হে আমাদের আব্বা! আপনার কী হয়েছে যে, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? অথচ আমরা তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুণ। তাহলে সে তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে, আর আমরা অবশ্যই তার হিফাযত করবো।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ১১-১২)

ইউসুফ আ.-এর ভ্রাতারা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে ভ্রমণে পাঠানোর আবেদন করলো, তখন হযরত ইয়াকূব আ. বললেন- তাকে পাঠানো আমি দু‘কারণে পছন্দ করি না। প্রথমতঃ এ নয়নের মণি আমার সামনে না থাকলে, আমি শান্তি পাই না। দ্বিতীয়তঃ আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।

ইয়াকুব আ.- এর এ বক্তব্য কালামে পাকের এ আয়াতে বিবৃত হয়েছে-

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣

“ইয়াকূব আ. বললেন- “আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে, অথচ তোমরা তার দিকে অমনোযোগী থাকবে।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ১৩)

বাঘের আশঙ্কা হওয়ার কারণ এই যে, তখন কেনানে বাঘের খুব উপদ্রব ছিল। ওদিকে হযরত ইয়াকূব আ. স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নীচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ আ.। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাঁকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে একটি বাঘ এসে তাঁকে মুক্ত করে দেয়, অতঃপর ইউসুফ আ. মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেন।

এর ব্যাখ্যা এভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশজন ভাই এবং যে বাঘটি তাকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা অথবা রুবিল। আর মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেয়ার অর্থ- কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকূব আ. স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাদেরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারনে ওদের কাছে কথা প্রকাশ করেননি। (আল-জামি‘লি আহকামিল কুরআন)

ভ্রাতারা হযরত ইয়াকূব আ.- এর একথা শুনে বলল- আপনার এ ভয় ভীতি অমূলক। আমরা দশজনের শক্তিশালী দল তার হিফাযতের জন্য বিদ্যমান রয়েছি। আমাদের সবার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, তাহলে আমাদের অস্তিত্বই নিস্ফল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা কোন কাজের আশা করা যেতে পারে?

নিম্নোলিখিত আয়াতে ইউসুফ আ.- এর ভ্রাতাদের সেই কথা বর্ণনা করা হয়েছে-

“তারা বললো- আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ১৪)

হযরত ইয়াকূব আ. পয়গম্বরসূলভ গাম্ভীর্যের কারণে পুত্রদের সামনে একথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করি। কারণ, এতে প্রথমতঃ তাদের মনোকষ্ট হত, দ্বিতীয়তঃ পিতার এরূপ বলার পর ভ্রাতাদের শত্রুতা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল ফলে এখন ছেড়ে দিলেও, অন্যকোন সময় কোন ছলছুতায় তাঁকে হত্যা করার ফিকিরে থাকত। তাই তিনি তাঁকে নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তবে ভাইদের কাছ থেকে অঙ্গীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে ইউসুফের কোনরকম কষ্ট না হয়। এ পর্যায়ে বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদার হাতে তাকে সোপর্দ করে বললেন- তুমি তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে খেয়াল রাখবে এবং শীঘ্রই ফিরিয়ে আনবে।

ভ্রাতারা পিতার সামনে ইউসুফকে কাঁধে তুলে নিলো এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছুদূর পর্যন্ত হযরত ইয়াকূব আ.ও তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্যে গেলেন।

ইমাম কুরতুবী রহ. ঐতিহাসিক রিওয়ায়াতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তারা যখন হযরত ইয়াকূব আ.-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন তারা ইউসুফ আ. কে নামিয়ে দিল এবং তিনি পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। কিন্তু অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে চলতে অক্ষম হচ্ছিলেন। আবার তিনি হত্যা করার ব্যাপারে ভাইদের পরামর্শ টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি একজন ভাইয়ের আশ্রয় নিতে চাইলেন। সে কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় তৃতীয়, চতুর্থ; এমনিভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল যে, তুই যে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র ও সূর্য তোকে সিজদা করতে দেখেছিস, তাদেরকে ডাক দে, তারাই তোকে সাহায্য করবে, আমরা তোকে সাহায্য করতে পারবো না।

ইমাম কুরতুবী রহ. এর ভিত্তিতেই বলেন যে, এ থেকে বোঝা যায় ভাইয়েরা কোন না কোন উপায়ে ইউসুফ আ. এর স্বপ্নের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্নই ইউসুফ আ. এর প্রতি তাদের তীব্র ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল। উক্ত স্বপ্নের কারণেই তারা ইউসুফ আ. এর সাথে হিংসাত্মক আচরণ করেছিল।

অবশেষে ইউসুফ আ. ইয়াহুদাকে বললেন- আপনি সবার বড়। আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনোকষ্টের কথা চিন্তা করে দয়ার্দ্র হোন। আপনি ঐ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করুন যা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চার হল এবং তাকে বললো- যতক্ষন আমি জীবিত আছি, এসব ভাই তোমাকে কোন কষ্ট দিতে পারবে না।

তখন ইয়াহুদার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বললো- নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহকে ভয় কর এবং বালকটিকে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবে না।

ভাইয়েরা উত্তর দিল- আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কী? তুমি পিতার অন্তরে নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। শুনে রাখো, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছা পূরণে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব।

ইয়াহুদা দেখল যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে সে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে বললো- তোমরা যদি এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাক, তবে আমার কথা শোন, নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। সাপ, বিচ্ছু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণী এখানে বাস করে। তোমরা তাকে সেই কূপে

ফেলে দাও। যদি কোন সাপ ইত্যাদি তাকে দংশন করে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে এবং নিজ হাতে হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, তবে হয়তো কোন কাফেলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বালতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। আর তারা তাকে সাথে করে অন্য কোন দেশে পৌঁছে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

এ প্রস্তাবে ভাইয়েরা সবাই একমত হলো। তাদের এ বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- "অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চললো এবং অন্ধকার কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হলো, তখন আমি তাকে ওহী দ্বারা জানিয়ে দিলাম যে, অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের একাজের কথা একসময় স্মরণ করিয়ে দিবে, আর তারা তখন তোমার উঁচু মর্যাদার কারণে তোমাকে চিনবে না।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ১৫)

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, এ ওহী সম্পর্কে দু'প্রকার অবস্থা সম্ভবপরঃ (এক) কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাঁর সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্যে এ ওহী পাঠানো হয়েছিল। (দুই) কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ আ. কে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জানিয়ে দিয়েছিলেন। এতে আরো বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমন পরিস্থিতি দেখা দিবে যে, তুমি তাদের তিরষ্কার করার সুযোগ পাবে। অথচ তারা ধারণাও করবেনা যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ। কারণ, তখন তুমি অনেক উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করবে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ইউসুফ আ. কে কূপে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হল, তখন তিনি কূপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। ভাইয়েরা তাঁর জামা খুলে তাদ্বারা তাঁর হাত বাঁধলো। তখন ইউসুফ আ. পুনরায় তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনও তারা পূর্বের মত সেই উত্তরই দিল যে, যে এগারটি নক্ষত্র তোকে সিজদা করেছিল, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোকে সাহায্য করবে। অতঃপর ভাইয়েরা তাকে একটি বালতিতে ভরে কূপে ছাড়তে লাগল। সেটা মাঝপথে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল।

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ইউসুফ আ. কে হিফাযত করলেন। যদ্দরুন পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনরূপ আঘাত পেলেন না। অতঃপর নিকটেই একখন্ড ভাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি সুস্থ ও বহাল তবিয়তে তার উপর বসে রইলেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, জিবরাঈল আ. আল্লাহ পাকের আদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তর খন্ডের উপর বসিয়ে দেন। ইউসুফ আ. তিনদিন কূপে অবস্থান করেন। ইয়াহুদা প্রত্যেহ গোপনে তাঁর জন্যে কিছু খাদ্য আনতো এবং বালতির সাহায্যে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতো। ইউসুফ আ. কে কূপে নিক্ষেপ করার পর তাঁর ভ্রাতারা সন্ধ্যাবেলায় ক্রন্দন করতে করতে তাদের পিতার নিকট উপস্থিত হলো। বিষয়টিকে নিম্নোক্ত আয়াতে

এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে-“আর তারা রাতের অন্ধকারে কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এলো।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ১৬)

হযরত ইয়াকূব আ. ক্রন্দনের শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন- ব্যাপার কী! তোমাদের ছাগপালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসুফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা যা বলল, তা পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে-“তারা বলল- হে আমাদের আব্বা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের আসবাবপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তখন তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না; যদিও আমরা সত্যবাদী হই।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ১৭)

ইউসুফ আ.- এর ভ্রাতারা তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিলো, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে, বাঘই তাঁকে খেয়ে ফেলেছে। পবিত্র কুরআনে তাদের এ প্রতারণার কথা এভাবে বিবৃত হয়েছে-“তারা ইউসুফের জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনলো।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ১৮)

কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাদের মিথ্যা বানাওটি ফাঁস করে দেয়ার জন্যে তাদেরকে একটি জরুরী বিষয় থেকে গাফেল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত লাগানোর সাথে সাথে জামাটিও ছিন্ন করে দিত, তবে ইউসুফকে বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারতো। কিন্তু তারা অক্ষত জামায় ছাগলছানার রক্ত মাখিয়ে পিতাকে ধোঁকা দিতে চাইল। ইয়াকূব আ. অক্ষত জামা দেখে বললেন- বাছারা! এ বাঘ কেমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে তো খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু জামার কোন অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি!

এভাবে হযরত ইয়াকূব আ. এর কাছে তাদের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গেলে, তিনি যা বললেন, তা কুরআন মাজীদের ভাষায় এই-

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّـهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

ইয়াকূব আ. বললেন- (এটা কখনই নয়;) বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন পূর্ণ ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছো, সে সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ১৮)

ওদিকে আল্লাহর মেহেরবানীতে একটি কাফেলা সেই অন্ধকার কূপের কাছে এসে উপস্থিত হয়। তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে পড়েছে। তারা পানি সংগ্রহকারীদেরকে পানি খোঁজার জন্য কূপে প্রেরণ করল। মিসরীয় কাফেলার পথ ভুলে এখানে পৌঁছা এবং এই অন্ধকার কূপের সম্মুখীন হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যারা সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তারা জানেন

যে, এসব ঘটনা একটি অপরটির সাথে পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। হযরত ইউসুফ আ. এর স্রষ্টা ও রক্ষকই কাফেলাকে তাদের গন্তব্যের পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এবং ইউসুফকে সাহায্য করার জন্য কাফেলার লোকদেরকে এই অন্ধকার কূপে প্রেরণ করেছেন।

পানি আনার জন্য কাফেলার মালেক ইবনে দোবর নামক জনৈক ব্যক্তি সেই কূপে পৌঁছেন এবং বালতি নিক্ষেপ করলেন। ইউসুফ আ. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল পানি উত্তোলনকারীদের দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে-

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

"একটি কাফেলা এলো। অতঃপর তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করলো। সে নিজের বালতি ফেললো। বলল- কী আনন্দের কথা! এতো একটি কিশোর!" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ১৯)

অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে ওঠা এই অল্প বয়স্ক অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন। মুসলিম শরীফের মিরাজ রজনীর হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-আমি ইউসুফ আ. এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বণ্টন করা হয়েছে।

কাফেলার লোকেরা তখন তাঁকে একটি মূল্যবান পণ্য মনে করে গোপন করে ফেলল। আয়াতের পরবর্তী অংশে সে কথা বলা হয়েছে- "তারা ব্যবসায়িক পণ্যরুপে তাকে গোপন করে ফেললো।" শুরুতে তো মালেক ইবনে দোবর এ কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন। কিন্তু পরে চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করলেন যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করা যায়।

অথবা এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ আ.-এর ভ্রাতারা ঐ মুহূর্তে সেখানে এসেছিল। তারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাঁকে পণ্যদ্রব্য করে নিলো। যেমন- কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে যে, ইয়াহুদা প্রত্যেহ ইউসুফ আ. কে কূপের মধ্যে খানা পৌঁছানোর জন্য যেত । তৃতীয় দিন তাঁকে কূপের মধ্যে না পেয়ে সে ফিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলো। অতঃপর সকল ভাই একত্রে সেখানে পৌঁছলো এবং অনেক খোঁজাখুজির পর কাফেলার লোকদের কাছ থেকে ইউসুফকে বের করলো। তখন তারা বলল- এ বালকটি আমাদের গোলাম, পলায়ন করে এখানে এসেছে। তোমরা একে কব্জায় নিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছো।

একথা শুনে মালেক ইবনে দোবর ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে গেলেন যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ-ভ্রাতারা নিজেরাই ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিল। তবে ভাইয়েরা যেহেতু এ মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, অপরদিকে তাদের আসল লক্ষ্য তার দ্বারা টাকা-পয়সা উপার্জন ছিলনা; বরং পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়াই ছিল মূল লক্ষ্য, তাই তারা তাঁকে গুটিকয়েক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। নিম্নবর্ণিত আয়াতে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে-"তারা তাঁকে বিক্রি করে দিল অতি অল্প মূল্যে-গুণাগুণিত কয়েক দিরহামে। আর তারা ছিল তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ২০)

কাফেলার লোকেরা তাঁকে মিসর নিয়ে গেলেন। সেখানে নেয়ার পর ইউসুফ আ. কে বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতেই ক্রেতারা প্রতিযোগীতামূলকভাবে দাম বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ আ. এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মৃগনাভি ও সমপরিমাণ রেশমী বস্ত্র দাম সাব্যস্ত হল।

আল্লাহ তা'আলা এ রত্ন আযীযে মিসরের (মিসরের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী) এর জন্য নির্ধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইউসুফ আ. কে ক্রয় করে নেন।

আল্লাহ তা'আলা মিসরে ইউসুফ আ. কে ক্রয় করার জন্য সে দেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যাক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। আল্লামা ঈসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. বলেন- "যে ব্যাক্তি হযরত ইউসুফ আ. কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। তার নাম কিতফীর। কোন কোন বর্ণনায় ইফতীরও এসেছে। তৎকালে মিসরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যাক্তি রাইয়ান ইবনে উসাইদ। তিনি পরবর্তীকালে ইউসুফ আ. এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তারই জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।" (তাফসীরে মাযহারী)

ক্রেতা আযীযে মিসর- এর স্ত্রীর নাম ছিল রাঈল কিংবা যুলাইখা। আযীযে মিসর কিতফীর ইউসুফ আ. সম্পর্কে স্ত্রীকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, নিম্নবর্ণিত আয়াতে তা-ই বিবৃত হয়েছে-

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ

"মিসরে যে ব্যাক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বললঃ তার সম্মানজনক থাকার ব্যবস্থা কর। হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নিব।" (সুরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ২১)

আয়াতে বর্ণিত ‘সম্মানজনক থাকার ব্যবস্থা’ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল- তাকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও, ক্রীতদাসের মত রেখো না এবং তার প্রয়োজনাদির সুবন্দোবস্ত কর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. বলেন, দুনিয়াতে তিন ব্যাক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরুপণকারী প্রমাণিত হয়েছেন। প্রথমজন আযীযে মিসর। তিনি স্বীয় নিরূপণশক্তি দ্বারা হযরত ইউসুফ আ. এর গুণাবলী সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তার স্ত্রীকে তার উত্তম বন্দোবস্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়জন হযরত শু‘আইব আ. এর ঐ কন্যা, যিনি মূসা আ. সম্পর্কে স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন, তা কুরআন মাজীদের ভাষায় এই-“পিতাজী! তাকে মজদুর রেখে দিন। কেননা, আপনার উত্তম মজদুর সবল ও বিশ্বস্ত ব্যাক্তিই হতে পারে।” (সূরাহ ক্বাসাস, আয়াতঃ২৬)

তৃতীয়জন আবু বকর সিদ্দীক রা.। তিনি স্বীয় দূরদর্শিতা দ্বারা ফারুকে আযম হযরত উমর রা. কে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

ইউসুফ আ. আযীযে মিসর- এর গৃহে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে এক পরীক্ষামূলক বিপদ এই দেখা দিল যে, আযীযে মিসর- এর স্ত্রী হযরত ইউসুফ আ. এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। এ প্রেক্ষিতে উক্ত মহিলা তার সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে তাকে ফুসলাতে লাগল। নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে-

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّـهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

“যে মহিলার ঘরে ইউসুফ আ. ছিলেন, সে তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সেই মহিলা বললঃ শোন! তোমাকে বলছি, এদিকে আস! তিনি বললেনঃ আল্লাহ রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আমার মালিক আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। আর অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীরা কখনো সফলকাম হয় না।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ২৩)

উক্ত মহিলা ছিল আযীযে মিসর- এর স্ত্রী। কিন্তু এ স্থলে পবিত্র কুরআনে ‘আযীযের পত্নী’ শব্দ ব্যবহার না করে ‘যার গৃহে ছিল’ এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইউসুফ আ. এর উক্ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরও অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে তারই আশ্রয়ে থাকতেন। সুতরাং তার আদেশ উপেক্ষা করা তার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

হযরত ইউসুফ আ. যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা‘আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বললেন- مَعَاذَ اللَّـهِ (আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে- তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের ওপর ভরসা করেননি, বরং মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, যে ব্যাক্তি আল্লাহর আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। এ ছাড়াও তিনি পয়গম্বরসূলভ বিজ্ঞতা ও নসীহত পেশ করে স্বয়ং সেই মহিলাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা। ইউসুফ আ. আরো বললেন যে, আপনার স্বামী আযীযে মিসর আমাকে লালন-পালন করেছেন, আমাকে উত্তম আবাসন দিয়েছেন। অতএব, তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী; অথচ আমি তার ইযযতে হস্তক্ষেপ করব! এটা জঘন্য অনাচার। আর অনাচারীরা কখনও কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না।

সুদ্দী ইবনে ইসহাক রহ. প্রমুখ তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় সেই মহিলা ইউসুফ আ. কে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে তার রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। সে বলল: তোমার চুল কত সুন্দর! ইউসুফ আ. বললেন: মৃত্যুর পর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর সে বলল: তোমার দুই চোখ কতই না আকর্ষণীয়! ইউসুফ আ. বললেন: মউতের পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। সে আরও বলল: তোমার মুখমণ্ডল কতইনা কমনীয়! ইউসুফ আ. বললেন: এগুলো সব মাটির খোরাক।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ আ. এর মনে পরকালের চিন্তা এত বেশী প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগ-বিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। এভাবে আখিরাতের চিন্তা-ই মানুষকে সব রকম অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে।

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, আযীযে মিসর- এর স্ত্রী যুলাইখা গৃহের দরজা বন্ধ করে ইউসুফ আ. কে পাপ কাজের দিকে আহবান করে। তখন ইউসুফ আ. স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শন অবলোকন করার সাথে সাথে যুলাইখার কুমতলবের নাগপাশ ছিন্ন করে রুদ্ধ দরজাসমূহের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন এবং কোনরূপ দ্বিধা বা চিন্তার মধ্যে সময় ক্ষেপণ করলেন না। এ সময় হযরত ইউসুফ আ. স্বীয় প্রতিপালকের কী নিদর্শন অবলোকন করেছিলেন, পবিত্র কুরআনে সেটা ব্যক্ত করা হয়নি। তবে বিভিন্ন রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে তাফসীরবিদগণ এ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যুবাইর, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী রহ. প্রমুখ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার মু'জিযা হিসেবে এ নির্জন কক্ষে হযরত ইয়াকুব এর চিত্র এভাবে ইউসুফ আ. এর সম্মুখে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে হুঁশিয়ার করেছেন।

কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন: আযীযে মিসর- এর মুখচ্ছবি তাঁর সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়। কেউ বলেন: ইউসুফ আ. এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠতেই সেখানে কুরআন মাজীদের এ আয়াত লিখিত দেখেন-

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“তোমরা ব্যাভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা খুবই জঘন্য নির্লজ্জতা (যা খোদায়ী শাস্তির কারণ) এবং অত্যন্ত গর্হিত পথ।” (সুরাহ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ৩২)

কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন- যুলাইখার গৃহে একটি মূর্তি ছিল। সেই মুহূর্তে যুলাইখা মূর্তিটিকে কাপড় দ্বারা আবৃত করল। ইউসুফ আ. এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে সে বলল: এটা আমার উপাস্য, এর সামনে পাপ কাজ করার মত সাহস আমার নেই। তখন ইউসুফ আ. বললেন, আমার উপাস্য তো আরো বেশী লজ্জা করার উপযুক্ত। কেননা, তাঁর দৃষ্টিকে কোন পর্দা ঠেকাতে পারে না।

কারো কারো মতে, ইউসুফ আ. এর নবুওয়াত ও দ্বীনী জ্ঞানই ছিল স্বীয় পালনকর্তা সম্পর্কে তাঁর এই দিব্যদৃষ্টির কারণ, যাকে আয়াতে ‘তার প্রতিপালকের নিদর্শন’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীরবিদ আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন: কুরআন মাজীদ যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু নিয়ে ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ আ. এমন কিছু দেখেছেন, যদ্দরুন তাঁর মন সৎ ও ন্যায়ের পথে আরো দৃঢ়পদ হয়েছেন। আর এ বিষয়টি কী ছিল, তাফসীরবিদগণ এ ব্যাপারে যা কিছু উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর যেকোন একটি হতে পারে। তাই নিশ্চিতরূপে কোন একটি নির্দিষ্ট করা যায় না।

হযরত ইউসুফ আ. এ নির্জন কক্ষে মহান আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উদ্যত হলেন এবং বন্ধ দরজার দিকেই দৌড় দিলেন। তখন আযীয পত্নী তাঁকে ধরার জন্য তাঁর জামা টেনে ধরে তাঁকে বহির্গমনে বাধা দিতে চাইল। কিন্তু ইউসুফ আ. পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প। তাই থামলেন না, বরং খুব দ্রুত বেগে সামনে ধাবমান হলেন। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে গেল। ইতিমধ্যে ইউসুফ আ. দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তাঁর পিছে পিছে যুলাইখাও তথায় উপস্থিত হল।

ঐতিহাসিক সুত্রে বর্ণিত আছে যে, দরজাসমূহ তালাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইউসুফ আ. দৌড়ে দরজায় পৌঁছতেই মহান আল্লাহর কুদরতে আপনাআপনি তালাগুলো খুলে নীচে পড়ে গেল এবং ততক্ষণাৎ ইউসুফ আ. বের হয়ে গেলেন।

তারা উভয়ে দড়জার বাইরে আসতেই আযীযে মিসরকে সামণে দন্ডায়মান দেখতে পেলেন। আযীযে মিসরকে দেখেই তার পত্নী চমকে উঠল। অতঃপর নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বানিয়ে ইউসুফে আ. এর উপর দোষ চাপিয়ে বলল: “আপনার পরিবারের সাথে যে কুর্কমের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি কী হতে পারে এ ছাড়া যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্যকোন কঠোর শাস্তি দেয়া হবে?

পবিত্র কুরআনে বিষয়টি এভাবে বিবৃত হয়েছে-"তারা উভয়ে ছুটে দড়জার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। আর উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল: যে ব্যাক্তি আপনার স্ত্রীর সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে এ ছাড়া আর কী শাস্তি দেয়া যেতে পারে যে, তাকে কারাগারে পাঠানো হবে অথবা অন্য কোন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে?"(সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ২৫)

ইউসুফ আ. পয়গম্বরসূলভ ভদ্রতার খাতিরে হয়ত সেই মহিলার গোপন অভিসন্ধির তথ্য প্রকাশ করতেন না। কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে ইউসুফ আ. এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিল, তখন বাধ্য হয়ে তিনি সত্য প্রকাশ করে বললেন; যা পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে ব্যাক্ত করা হয়েছে- "বরং তিনিই স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ফুঁসলিয়েছেন।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ৬২)

ব্যাপারটি খুবই নাজুক এবং আযীযে মিসর- এর পক্ষে কে সত্যবাদী, তার মীমাংসা করা কঠিন ছিল। কেননা, সেখানে সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ ও পবিত্র রাখেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁদেরকে অশুভ চক্রান্ত থেকে বাঁচিয়ে রাখারও ব্যবস্থা করেন।

সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ কথা বলতে অক্ষম নবজাতক শিশুদেরকে কাজে লাগান। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বান্দাদের পবিত্রতা প্রমাণ করেন। যেমন, হযরত মারিয়ামের প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের নবজাতক শিশু ঈসা আ. কে আল্লাহ তাআলা বাকশক্তি দান করে তাঁর মুখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন। তেমনিভাবে বনী ইসরাঈলের জুরাইজ নামক একজন সাধু ব্যক্তির প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করা হলে, নবজাতক শিশু সেই ব্যক্তির পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করে। অনুরূপভাবে হযরত মূসা আ.- এর প্রতি ফিরআউনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে, ফিরআউন পত্নীর কেশ পরিচর্যাকারীণী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং সে মূসা আ. কে শৈশবে ফিরআউনের কবল থেকে রক্ষা করে।

ঠিক তেমনিভাবে ইউসুফ আ. এর ঘটনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু হুরাইরা রা. এর বর্ণনায় রয়েছে, মহান আল্লাহ একটি কচি শিশুকে বিজ্ঞ ও দার্শনিকসূলভ বাকশক্তি দান করলেন। এই কচি শিশু এ গৃহেই দোলনায় ললিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে কারো ধারণা ছিল না যে, সে এসব কর্মকাণ্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনাকারীদের সঠিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্যে জগতবাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু তাঁর গুপ্ত বাহিনী। এরা অপরাধীকে ভালভাবেই চেনে, তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং

প্রয়োজন মুহূর্তে তা প্রকাশও কারে দিতে পারে। এ ছোট্ট শিশুটি বাহ্যত জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল। সে ইউসুফ আ.-এর মু'জিযা হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুলল-যখন আযীযে মিসর ছিলেন এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত।

এ শিশুটি যদি এতটুকু বলে দিত যে, ইউসুফ আ. নির্দোষ এবং দোষ যুলাইখার, তবে তাও একটি মু'জিযারূপে ইউসুফ আ.- এর পক্ষে তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি উচ্চারণ করালেন এভাবে যে, সে বলল- "ইউসুফ আ. এর জামাটি দেখ, যদি তা সামনের দিকে ছেঁড়া থাকে, তবে যুলাইখার কথা সত্য এবং ইউসুফ আ. মিথ্যাবাদী পরিগণিত হবেন। আর যদি জামাটি পেছন দিকে ছেড়া থাকে, তাহলে এতে এ ছাড়া অন্যকোন সম্ভাবনাই নেই যে, ইউসুফ আ. পলায়নরত ছিলেন এবং যুলাইখা তাঁকে পিছন থেকে আটকে ধরে পলায়নে বাঁধা দিতে চাচ্ছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউসুফ আ. সত্যবাদী সাব্যস্ত হবেন এবং যুলাইখা হবে মিথ্যাবাদী।" এটা এজন্য এভাবে উপস্থাপন করা হল যে, শিশুর অলৌকিক বাকশক্তির ছাড়াও এ বিষয়টি প্রত্যেকের হৃদয়াঙ্গম করার মতো, যদ্দরুন এর চাক্ষুষ প্রমাণ আযীযে মিসর নিজেই পেয়ে যেতে পারেন।

অতঃপর যখন বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটির পেছন দিক থেকে ছেঁড়া দেখা গেল, তখন ইউসুফ আ. এর পবিত্রতা বাস্তবভাবেই প্রতিভাত হয়ে গেল। পবিত্র কুরআনে নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহে এ বিষয়টিই বিবৃত হয়েছে- "মহিলার পরিবারের একজন সাক্ষী (শিশু) সাক্ষ্য দিলো যে, যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী হবে। আর যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী হবে। অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে বলল: নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা অত্যন্ত ভীষণ। (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ২৬-২৮)

আযীযে মিসর শিশুটির এভাবে কথা বলার দ্বারাই বুঝে নিয়েছিলেন যে, ইউসুফ আ.-এর পবিত্রতা পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যই এ অস্বাভাবিক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

তদুপরি তার বক্তব্য অনুযায়ী যখন দেখলেন যে, ইউসুফ আ. এর জামাটি পেছন থেকে ছেঁড়া, তখন আযীযে মিসর নিশ্চিত হলেন যে, দোষ যুলাইখার এবং ইউসুফ আ. পবিত্র। তাই তিনি যুলাইখাকে সম্বোধন করে বললেন, "এসব তোমার ছলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে এ ফন্দি এটেছো।"

উক্ত আয়াতে আযীযে মিসর নারী জাতির ছলনা অত্যন্ত মারাত্মক বলে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবিক-ই নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বোঝা এবং এর জাল

ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা তারা বাহ্যত কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। তাই যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। অথচ এসব ক্ষেত্রে অনেকাংশেই তারা বিবেক-বুদ্ধি ও আল্লাহভীতির অভাব বশত মিথ্যা ছলনা করে থাকে এবং কথা বানোয়াটি করে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে থাকে। অবশ্য যারা আল্লাহভীরু ও পরহেযগার, তারা কখনও এরূপ ছলনা করে না। (তাফসীরে মাযহারী)

অতঃপর ঘটনার প্রেক্ষিতে আযীযে মিসর ইউসুফ আ. কে যা বললেন, তা পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে- يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا ۚ

“ইউসুফ! এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর (এবং ব্যাপারটি বলাবলি করো না। যাতে আমার বেইজ্জতি না হয়।)” (সুরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ২৯)

পরিশেষে তিনি যুলাইখাকে আত্নসংশোধনের জন্য যে উপদেশ দিলেন, তা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾

“তুমি নিজের অন্যায়ের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) কর। তুমি তো পাপীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছ।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ২৯)

এখানে বাহ্যত বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করতে বলা হয়েছে। আবার এটাও হতে পারে যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। কিংবা এটাও হতে পারে যে, ইউসুফ আ.- এর কাছে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে।

অতঃপর এক কান দু‘কান করে ব্যাপারটি লোকসমাজে জানাজানি হয়ে গেল। তখন নগরের কতিপয় মহিলা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযে মিসর-এর স্ত্রী স্বীয় গোলামকে অবৈধ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ফুঁসলায়! ছিঃ কেমন রুচি! কত নিচু তার মন যে, চাকরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে! কুরআন পাকের নিম্নোলিখিত আয়াতে তাদের এ কুৎসা রটনা বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে- “নগরের মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কামনা চরিতার্থ করার জন্য ফুঁসলায়। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে! আমরা তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৩০)

যুলাইখা যখন সেসব মহিলাদের কানাঘুষার কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি এবং ইউসুফ আ.- এর ব্যাপারে তার অভিপ্রায়ের যৌক্তিকতা প্রকাশ করতে চাইল। নিম্নের আয়াতে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে- “যখন সে (যুলাইখা) তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে শুনতে পেল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য একটি ভোজ সভার আয়োজন করল। সে তাদের হেলান দেয়ার জন্য উন্নত বিছানার ব্যবস্থা

করল এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল। আর ইউসুফ আ. কে বলল- এদের সামনে একটু বের হও।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৩১)

উল্লেখিত আয়াতে মহিলাদের কানাঘুষাকে যুলাইখা 'চক্রান্ত' আখ্যা দিয়েছে বলে বলা হয়েছে। অথচ বাহ্যত তারা কোন চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করছিল, তাই যুলাইখা একে চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছে। কেননা, তাদের কোন আপত্তি থাকলে সাক্ষ্য করে বলা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা না করে অগোচরে সমালোচনা করে বেড়াচ্ছে।

অতঃপর মহিলারা যখন ভোজসভায় উপস্থিত হল, তখন তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল-ফলাদি উপস্থিত করা হল। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার মত ছিল। তাই প্রত্যেককে এক একটি করে চাকু দেয়া হল। তারা সেই ফল হাতে নিয়ে চাকু দ্বারা কেটে কেটে খেতে লাগল।

ইতোমধ্যে অন্যকক্ষে অবস্থানরত ইউসুফ আ. কে যুলাইখা কোন কাজের বাহানায় বললঃ এই মহিলাদের এখানে একটু আস।

ইউসুফ আ. তার কু-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতেন না। পাশের কামরায় যে তার আমন্ত্রিত মহিলারা সমবেত, আগে তাও জানতেন না। তাই মনিবের নির্দেশে স্বীয় কামরা থেকে বের হয়ে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন।

অপরদিকে হযরত ইউসুফ আ. কে দেখামাত্র উপস্থিত মহিলাদের মাঝে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতে তা ব্যক্ত করা হয়েছে- "যখন আমন্ত্রিত মহিলারা ইউসুফ আ. কে এক নজর দেখল, তখন তারা হতভম্ভ হয়ে গেল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। আর তারা বললঃ সুবহানাল্লাহ! এ-তো মানব নয়, এ-তো কোন সম্মানিত ফেরেশতা! (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৩১)

বলাবাহুল্য, উপস্থিত মহিলারা ইউসুফ আ. কে দেখে তার রূপ-সৌন্দর্য্য অবলোকন করে হতভম্ভ হয়ে গেল এবং তখন যে চাকু দিয়ে ফল কেটে খাচ্ছিল, তাতে ফলের পরিবর্তে হাত কেটে ফেলল। আর তারা ইউসুফ আ. কে ফেরেশতা বলে আখ্যায়িত করল। কেননা, তারা এরূপ অনন্যা রূপ-সৌন্দর্য্যের অপরূপ নূরানী চেহারার মানুষ কখনও দেখেনি।

অতঃপর যুলাইখা উপস্থিত মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতে যা ব্যক্ত করা হয়েছে- "এই সেই জন, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভৎসনা করেছিলে। আর হ্যাঁ, আমি বাস্তবিকই তাকে ফুঁসলিয়ে ছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। তবে ভবিষ্যতে আমি তাকে যে আদেশ দিই, সে যদি তা পালন না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে যাবে এবং লাঞ্ছিত হবে।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ৩২)

যুলাইখা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলারা তার ব্যাপারটির তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে, এমনকি তাঁকে দেখে নিজেরাও অপ্রকৃতস্থ হয়ে গিয়েছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ আ. কে ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল যে, ভবিষ্যতে তুমি যদি আমার আদেশ অমান্য কর, তবে অবশ্যই জেলখানায় নিক্ষেপ করা হবে। কোন কোন তাফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারাও ইউসুফ আ. কে যুলাইখার প্রতি ফুঁসলাতে লাগল যে, তুমি যুলাইখার কাছে অনেক ঋণী। কাজেই তোমার জন্য তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।

ইউসুফ আ. দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও যুলাইখার সুরে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে এবং এ মুহূর্তে তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোন উপায় নেই। তখন উক্ত কঠিন মুহূর্তে তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে দু'আ করে আরজ করলেন, পবিত্র কুরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾

"হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান করছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি তাদের চক্রান্তকে আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তাহলে আমি তাদের ফাঁদে আটকে যাবো এবং জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বো। (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৩৩)

"জেলখানা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়"- এ কথা বলা ইউসুফ আ. এর বন্দিজীবন প্রার্থনা বা কামনা করা হয়; বরং পাপ কাজের বিপরীত এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে করারই বহিঃপ্রকাশ।

কোন কোন রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, যখন হযরত ইউসুফ আ. জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী এলো- আপনি নিজে কে নিজে জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন- জেলখানা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। এটা না করে আপনি নিরাপত্তা চাইলে, আপনাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দান করা হত।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ আ.-এর দু'আ কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিম্নোলিখিত আয়াতে সে কথা ব্যাক্ত করা হয়েছে- "অবশেষে তার পালনকর্তা তার দু'আ কবুল করলেন এবং তার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা-সর্বজ্ঞ। (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৩৪)

আল্লাহ তা'আলা সেই মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ আ. কে বাঁচানোর জন্যে একটি ব্যবস্থা করলেন এই যে, ইউসুফ আ. এর দু'আ অনুযায়ী তাঁকে জেলে

স্থানান্তরের ব্যবস্থা করলেন। তা এভাবে যে, ইউসুফ আ. এর সচ্চরিত্রতা, তাক্বওয়া ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখে আযীযে মিসর ও তার পরিষদবর্গের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ইউসুফ আ. সৎ ও পবিত্র। কিন্তু শহরময় এ বিষয়ে ব্যাপক কানাঘুষা হতে থাকে। পরিশেষে এ কানাঘুষার অবসান ঘটানোর জন্যে এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হয় যে, ইউসুফ আ. কে কিছুদিনের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এর দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এবং জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে যাবে। নিম্নবর্ণিত আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে- "অতঃপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে কিছুদিনের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখা সমীচীন মনে করল।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ৩৫)

পরিশেষে আযীযে মিসর ও তার পরিষদবর্গ কিছুদিনের জন্য ইউসুফ আ. কে জেলে আবদ্ধ করল। সেমতে ইউসুফ আ. জেলের বন্দীখানায় কালাতিপাত করতে লাগলেন।

হযরত ইউসুফ আ. কারাগারে পৌছলে সাথে আরো দু'জন অভিযুক্ত কয়েদীও প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহকে শরাব পান করাত এবং অপরজন বাদশাহর বাবুর্চি ছিল। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. তাফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, তারা উভয়ে বাদশাহর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মুকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

হযরত ইউসুফ আ. কারাগারে প্রবেশ করে পয়গম্বরসূলভ চরিত্র- দয়া ও অনুকম্পার দ্বারা সকলের মন জয় করেন। তিনি সকল কয়েদির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতেন এবং যথাসাধ্য তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-যত্ন করতেন। কাউকে চিন্তিত ও পেরেশানীযুক্ত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন, ধের্য্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। এভাবে নিজে কষ্ট করে অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

তাঁর এ অবস্থা দেখে কারাগারের সকল কয়েদী তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে লাগল। কারাধ্যক্ষ তাঁর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বললঃ আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোনরূপ কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি। এতটুকু আমার ইখতিয়ারে আছে।

ইউসুফ আ. এর সাথে যে দু'জন কয়েদী কারাগারে প্রবেশ করেছিল, তারা একদিন বললঃ আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। এ কথা বলে তারা তাঁর নিকট স্বপ্নের কথা প্রকাশ করে তা'বীর জানতে চাইল।

তাদের মধ্যে যে বাদশাহকে শরাব পান করাত সে বললঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আঙ্গুর থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ বাবুর্চি বললঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার মাথায় রুটি ভর্তি একটি ঝুঁড়ি রয়েছে আর তা থেকে পাখিরা ঠুকরিয়ে

ঠুকরিয়ে আহার করছে। অতঃপর তারা উভয়ে ইউসুফ আ. কে তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে-

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

“তাঁর সাথে দু‘জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বললঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি শরাব নিংড়াচ্ছি। আর অপরজন বললঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখি ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আপনি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দিন। আমরা আপনাকে নেককার বলেই জানি।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ৩৬)

ইউসুফ আ. এর কাছে তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি পয়গাম্বরসূলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তরদানের পূর্বে তাদের ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং তাদের নিকট দ্বীনপ্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন।

দাওয়াতের মূলনীতি অনুযায়ী, হিকমত ও বিচক্ষণতাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু‘জিযার কথা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্যে প্রত্যেহ যেই খাদ্য তোমাদের বাসা, কারাগার কিংবা অন্য কোন জায়গা থেকে আসে, তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ, ও সময় সম্পর্কে বলে দিব। আর এটা কোন ভবিষ্যত কথন, জ্যোতিষবিদ্যা কিংবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেলকি নয়, বরং আমার পালনকর্তা ওহীর মাধ্যমে আমাকে তা বলে দেন বলেই আমি তা তোমাদেরকে বলে দিতে পারি। পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতে এ বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে- “ইউসুফ আ. বললেন তোমাদেরকে প্রত্যেহ যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তা ব্যাখ্যা তোমাদেরকে বলে দিব। এ জ্ঞান আমাকে আমার রব শিক্ষা দিয়েছেন।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৩৭)

এরপর ইউসুফ আ. প্রথমে তাদের কাছে কুফরের নিন্দা এবং কাফেরদের ধর্মের প্রতি স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করলেন। অতঃপর আরো বললেন যে, আমি নবীপরিবারেরই একজন এবং তাঁদেরই সত্য দ্বীনের অনুসারী। আমার পিতৃপুরুষ হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব আ.।

এরপর বললেন যে, আল্লাহ তা‘আলার সাথে খোদায়ী গুণাবলীতে কাউকে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা আমাদের জন্য মোটেই বৈধ নয়। আর এ দ্বীনে হক্কের তাওফীক অর্জন আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ। তিনি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু অনেক মানুষই এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। পবিত্র কুরআনের নিম্নোলিখিত আয়াতে একথা বিবৃত হয়েছে- “[ইউসুফ আ. বললেন-] আমি

ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং আখিরাতকে অবিশ্বাস করে। আমি আপন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাত অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য কিছুতেই শোভা পায় না যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কোন বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৩৭-৩৮)

অতঃপর হযরত ইউসুফ আ. কয়েদীদের প্রশ্ন করলেনঃ আচ্ছা, তোমরাই বল, অনেক পালনকর্তার উপাসক হওয়া ভাল, নাকি এক আল্লাহর দাস হওয়া ভাল, যিনি সবার উপরে পরাক্রমশালী। তারপর অন্য এক পন্থায় মূর্তিপূজার অনিষ্টতা বর্ণনা করে বললেনঃ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কিছুসংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তারূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। অথচ এদের মধ্যে এমন কোন সত্তাগত গুণ নেই যে, এদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ, এরা সবাই যে চেতনা ও অনুভূতিহীন এটা চাক্ষুষ বিষয়। অবশ্য এদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপায় ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা এদের আরাধনার জন্যে নির্দেশ নাযিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, যুক্তি ও বিবেক বুদ্ধি যদিও এদের খোদায়ী স্বীকার না করত, কিন্তু আল্লাহ পাকের নির্দেশের কারণে আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও যুক্তি প্রমাণ ছেড়ে তাঁর নির্দেশে পালন করতাম। কিন্তু এখানে এরূপ কোন নির্দেশও নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলার এসব কৃত্রিম উপাস্যের ইবাদত করার ব্যাপারে কোন যুক্তি-প্রমাণ কিংবা হুকুমও নাযিল করেননি। বরং তিনি একথাই বলেছেন যে, ইবাদত গ্রহণের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই। অতঃপর হযরত ইউসুফ আ. তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য দ্বীনই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য জানে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে রয়েছে-

"[ইউসুফ আ. বললেন-] হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে কেবল কতগুলো নামের উপাসনা কর, যে নামগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এদের ব্যাপারে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। " (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৩৯-৪০)

দ্বীন প্রচার, দ্বীনী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পন্ন করার পর ইউসুফ আ. কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেনঃ তোমাদের একজন মুক্তি পাবে এবং চাকুরীতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহকে শরাব পান করাবে। আর অপরজনের

অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শুলে চড়ানো হবে। তখন পাখিরা তার মাথার মগজ ঠুকরিয়ে খাবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে- "ইউসুফ আ. বললেন- হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন আপন মনিবকে শরাব পান করাবে এবং অপরজনকে শুলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ৪১)

বিশিষ্ট তাফসীর বিশারদ আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. বলেন, উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্ধারিত ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যাক্তি বাদশাহকে শরাব পান করাত, সে খালাস পেয়ে চাকুরীতে পুনর্বহাল হবে এবং অপরজন তথা বাবুর্চিকে শুলে চড়ানো হবে। কিন্তু ইউসুফ আ. পয়গাম্বরসূলভ অনুকম্পার কারণে নিদিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাদের অমুককে শুলে চড়ানো হবে। যাতে সে এখন থেকেই চিন্তান্বিত না হয়ে পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে শুলে চড়ানো হবে। সর্বশেষ ইউসুফ আ. বললেনঃ আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা নিছক অনুমানভিত্তিক নয়; বরং এটাই আল্লাহ তা'আলার অটল ফয়সালা।

অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ আ. বললেনঃ যখন তুমি খালাস পেয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌঁছবে, তখন তুমি বাদশাহর কাছে আমার বিষয়ে আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ে লোকটি মুক্তি পেল। কিন্তু মুক্তি পেয়ে সে ইউসুফ আ. এর কথা ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ আ. এর মুক্তির ব্যাপারটি আরো বিলম্বিত হয়ে গেল। তাতে করে আরো কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হল। নিম্নবর্ণিত আয়াতে এ কথাই উল্লেখ করা হয়েছে- "তাদের দু'জনের মধ্যে যে ব্যাক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে ইউসুফ আ. তাকে বললেনঃ আপন মনিবের কাছে আমার কথা আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে মনিবের কাছে তার আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তিনি কয়েক বছর কারাগারে কাটালেন।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৪২)

অত্র আয়াতের بضع শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরও সাত বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আ. এর মুক্তির জন্য কুদরতীভাবে এ ব্যবস্থা সৃষ্টি করলেন যে, বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগকুল হয়ে পড়লেন। তাই রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যা দাতা ও অতীন্দ্রিয়বাদদেরকে একত্রিত করে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু স্বপ্নটি কারো বোধগম্য হল না। তাই তারা কেউ বললঃ এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। আবার কেউ বললঃ এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। অন্যরা বললঃ আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। বাদশাহ স্বপ্নে কী দেখেছিলেন এবং পরিষদবর্গ উত্তরে কী বলেছেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে-

“বাদশাহ বললেন- আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটা-তাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক দেখলাম। হে পরিষদবর্গ“ তোমরা আমাকে এ স্বপ্ন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দাও, যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। তারা বললঃ এটা অর্থহীন কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমরা অবগত নই।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৪৩-৪৪)

সেই মুহূর্তে দীর্ঘকাল পর মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর ইউসুফ আ. এর কথা মনে পড়ল। তৎক্ষণাত সে বাদশাহর নিকট গিয়ে বললঃ আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। আমাকে এ জন্য ইউসুফ আ. এর নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- “বন্দীদ্বয়ের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর তার [ইউসুফআ.এর কথা] স্মরণ হলো, সে বলল-আমি আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে পারব। আমাকে ইউসুফ আ. এর নিকট প্রেরণ করুন।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াত:৪৫)

এ পর্যায়ে সে ইউসুফ আ.-এর গুণাবলী, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ থাকার কথাও বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, যেন তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

বাদশাহ সেই লোকের কথামত তাকে ইউসুফ আ. এর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। সে ইউসুফ আ. এর কাছে গিয়ে আরজ করল (পবিত্র কুরআনের ভাষায়)

“হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটা-তাজা গাভী- তদেরকে খাচ্ছে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক শীষ। আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্নের তা‘বীর সম্পর্কে পথনির্দেশ করুন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে অবগত করতে পারি।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৪৬)

লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ আ. এর সত্যবাদিতা বা কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার স্বীকৃতি প্রকাশ করল। অতঃপর আবেদন করল যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্নটি হচ্ছে, বাদশাহ সাতটি মোটা-তাজা গাভী দেখেছেন, যেগুলোকে অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলেছে। এ ছাড়াও তিনি সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন। আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে আমি ফিরে গিয়ে বাদশাহর কাছে তা বর্ণনা করব। আর অবশ্যই এতে তিনি আপনার জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে অবগত হবেন।

হযরত ইউসুফ আ. উক্ত স্বপ্নের বিবরণ শুনে তার ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে যে, সাতটি মোটা-তাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলন সম্পন্ন সাত বছর অতিক্রান্ত হবে। তেমনি ভাবে সাতটি শীর্ণ অর্থ হচ্ছে- এরপর দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে। আর এগুলো প্রথম সাতটি গাভীতে খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে প্রচুর-ফলন সম্পন্ন সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত

বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বীজের জন্য কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে যাবে। কুরআন পাকের নিম্নবর্ণিত আয়াতে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে- "ইউসুফ আ. বললেনঃ তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কর্তন করবে, তার মধ্যে যে পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত গুদামজাত করে রাখবে এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর। তোমরা পূর্বে যা সঞ্চয় করে রেখেছিলে, এ সাত বছরে তা খেতে থাকবে- শুধু সামান্য পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৪৭-৪৮)

বাদশাহর স্বপ্নে মূলত এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভাল ফসল হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু ইউসুফ আ. এর সাথে আরো একটু বিষয় যুক্ত করে বললেন, "এরপরেই আসবে এমন একটি বছর, যাতে মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং এতে তারা রস নিংড়াবে।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৪৯) অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বছরগুলো অতিক্রান্ত হয়ে গেলে, এক বছর খুব বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে।

হযরত ক্বাতাদাহ রা. বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ আ. কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করেছিলেন। যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু জ্ঞান তারা লাভ করে এবং এতে তাঁর জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ পায়। তাতে তার মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে।

তদুপরি ইউসুফ আ. শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছর যেই অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে, যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না।

বাদশাহ নিজ স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে আশ্বস্ত হলেন এবং ইউসুফ আ. এর জ্ঞান গরিমায় বিমুগ্ধ হয়ে আদেশ দিলেন যে, তাকে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এসো। আদেশের সাথে সাথে বাদশাহর জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌঁছল।

ইউসুফ আ. সুদীর্ঘ বন্দিজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করেছিলেন। কাজেই বাদশাহর ফরমানকে সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাত প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি সরাসরি তা করলেন না। বরং আল্লাহ পাক স্বীয় পয়গাম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, সেই মর্যাদার আলোকে তাঁদেরকে নির্দোষ রাখতে চান। তাই আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আ. এর নির্দোষ প্রমাণ করার ব্যবস্থা করলেন। সেমতে ইউসুফ আ. দূতকে বললেন (পবিত্র কুরআনের ভাষায়)- "ফিরে যাও তোমরা মনিবের কাছে এবং তাকে জিজ্ঞেস কর ঐ রমণীদের কি অবস্থা, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল? আমার রব তো তাদের ছলনা সবই অবগত।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৫০)

অর্থাৎ ইউসুফ আ. বললেন তুমি বাদশাহের কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস কর যে, হস্তকর্তনকারিণী মহিলাদের ব্যাপারে তিনি জানেন কিনা? এবং আমাকে নির্দোষ বলে জানেন কিনা?

হযরত ইউসুফ আ. কারাগার থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ পাওয়ার পরও সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন না, বরং আগে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করাতে চাইলেন। তাই বাদশাহ যখন ইউসুফ আ. কে মুক্ত করে রাজদরবারে তার নিকট নেয়ার জন্য দূত পাঠালেন, তখন তাকে বাদশাহর নিকট ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং বলে পাঠান যে, যে মহিলারা ইউসুফ আ. কে দেখে হতভম্ব হয়ে হস্ত কর্তন করেছিল, তাদের মাধ্যমে যেন তিনি ঘটনার তদন্ত করে প্রকৃত দোষীকে সনাক্ত করেন।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

“বাদশাহ বললেন- ইউসুফকে (মুক্ত করে) আমার নিকট নিয়ে এসো। যখন দূত (এ পয়গাম নিয়ে) ইউসুফ আ. এর নিকটে এলো, তিনি তাকে বললেন-তোমার মনিবের নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা করো সেই মহিলাদের কী হাল-যারা হাত কেটেছিল? নিশ্চয়ই আমার প্রভু তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৫০)

এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ আ. এ স্থলে হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আযীয পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি। অথচ সে-ই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু।

এর কারণ হচ্ছে, যেহেতু ইউসুফ আ. আযীযগৃহে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তাই ভদ্রতার খাতিরে সরাসরি আযীযপত্নীর নাম উল্লেখ করেননি। তবে তার জানা আছে যে, সেই মহিলাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলেই আযীযপত্নীর কথা এমনিতেই বেরিয়ে আসবে।

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। আর তা এ মহিলাদের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে যেতে পারে এবং তাতে তাদের তেমন কোন অপমানও নেই। তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দেয়ার দোষ তাদের ঘাড়ে চাপবে। কিন্তু আযীযপত্নীর অবস্থা এরূপ ছিল না। তাই সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে, তাকে ঘিরেই তদন্তকার্য অনুষ্ঠিত হত। ফলে তার অপমান বেশী হত। তৃতীয় কারণ এই যে, আযীযপত্নী আযীযে মিসর-এর নিকট ঘটনা অস্বীকার করে ইউসুফ আ. এর উপর দোষ চাপালেও হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদের নিকট নিজের সব দোষ অকাতরে স্বীকার করেছেন এবং তাদের সামনেই ইউসুফ আ. কে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করলে কঠোর শাস্তি প্রদানের ধমকি দিয়েছেন। সুতরাং হস্ত

কর্তনকারিণী মহিলাদের জিজ্ঞেস করলেই সত্য ঘটনা প্রমাণ হয়ে পড়বে। আর এতে করে ইউসুফ আ. এর নির্দোষিতা তো প্রমাণ হবেই, অধিকন্তু তাঁর সততা, সৎপরায়ণতা ও চারিত্রিক পবিত্রতাও ভাস্বর হয়ে উঠবে।

ইউসুফ আ. সাথে সাথে আরো বললেনঃ "আমার পালনকর্তা তাদের মিথ্যা ও ছল-চাতুরি সম্পর্কে সম্যক অবহিত।" সুতরাং আমি চাই যে, বাদশাহও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন এবং তিনি যেন বুঝতে পারেন যে, ইউসুফ আসামী হিসেবে জেলে ছিলেন না, বরং মজলুম হয়ে জেলে ছিলেন।

কুরআন মাজীদের আয়াতের এ অংশে সূক্ষ্মভাবে ইউসুফ আ. এর পবিত্রতার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

বাদশাহ তৎক্ষণাত ইউসুফ আ. এর দাবী অনুযায়ী হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদেরকে জিজ্ঞাসা করে ঘটনার তদন্ত করলেন। তখন যুলাইখা ও অন্যসব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল। পবিত্র কুরআনে নিম্নবর্ণিত আয়াতে এ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে-

"বাদশাহ মহিলাদেরকে বললেন- তোমাদের ঘটনা সম্পর্কে কী মূল্যায়ন- যখন তোমরা ইউসুফকে কামনা চরিতার্থ করার জন্যে ফুঁসলিয়েছিলে? তারা বললঃ সুবহানাল্লাহ! আমরা তাঁর সম্পর্কে মন্দ কিছুই জানি না। তখন আযীযপত্নী বললঃ এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আমিই তাকে স্বীয় কামনা চরিতার্থের জন্য ফুঁসলিয়েছিলাম এবং নি:সন্দেহে সে-ই সত্যবাদী।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৫১)

"স্বীয় পবিত্রতা ও সত্যবাদিতা প্রকাশ হওয়ার পর ইউসুফ আ. আশ্বস্ত হলেন। অতঃপর নিজের এ প্রক্রিয়ার পক্ষে সাফাই প্রকাশ করে বললেন; "আমার এ তদন্ত কামনা এজন্য যে, যাতে আযীয মিসর জানতে পারেন, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তকে এগুতে দেন না।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৫২)

মিসরের বাদশাহ তখন ইউসুফ আ. এর সততা, সাধুতা ও বিশ্বস্ততায় প্রীত ও সন্তুষ্ট হলেন। তাই পুনরায় দূতকে ইউসুফ আ. এর নিকট পাঠিয়ে বললেন- ইউসুফ আ. কে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত উপদেষ্টা নির্বাচিত করবো।

নির্দেশ অনুযায়ী ইউসুফ আ. কে সসম্মানে কারাগার থেকে রাজ দরবারে নিয়ে আসা হল। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ফলে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ বললেনঃ "আপনি আজ থেকে আমাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব।" কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছেঃ

"বাদশাহ বললেন- তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে নিজের একান্ত সহকারী বানাবো। অতঃপর তিনি যখন তার সাথে মতবিনিময় করলেন, তখন

বললেনঃ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৫৪)

ইমাম বাগাবী রহ. বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহর দূত দ্বিতীয়বার কারাগারে ইউসুফ আ. এর কাছে পৌঁছল এবং বাদশাহর পয়গাম পৌঁছল, তখন ইউসুফ আ. সব কারাবাসীর জন্য দু‘আ করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি বাদশাহর দরবারে পৌছে এই দু‘আ পড়লেন-

حَسْبِىْ رَبِّىْ من دُنْيَا ى وَ حَسْبِىْ رَبِّىْ مِنْ خَلقة – عَزَّ جَا رُهُ وَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَا الهَ غَيْرُهُ

(অর্থঃ আমার দুনিয়ার জন্য আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সকল সৃষ্টির মুকাবিলায় আমার রবই আমার জন্য যথেষ্ট। যে তাঁর আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে, তার স্থান সিফাত উচ্চ মর্যাদার হয়ে যায়। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।)

অতঃপর ইউসুফ আ. আরবী ভাষায় সালাম প্রদান করেনঃ ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ’ এবং বাদশাহর জন্য হিব্রু ভাষায় দু‘আ করেন। বাদশাহ অনেক ভাষা জানতেন, কিন্তু আরবী ও হিব্রু ভাষা তার জানা ছিল না। ইউসুফ আ. বলে দেন যে, সালাম আরবী ভাষায় করা হয়েছে এবং দু’আ হিব্রু ভাষায় করা হয়েছে।

এ রিওয়ায়াতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাদশাহ ইউসুফ আ. এর জ্ঞান-প্রজ্ঞা উপলব্ধির জন্য তাঁর সাথে বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন। ইউসুফ আ. তাকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং সাথে সাথে আরবী ও হিব্রু এই দু‘টি অতিরিক্ত ভাষাও শুনিয়ে দেন। এতে যোগ্যতা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

অতঃপর বাদশাহ বললেনঃ আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা সরাসরি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। ইউসুফ আ. প্রথমে মূল স্বপ্ন সম্বন্ধে এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ নিজেও কারো কাছে বর্ণনা করেননি। অতঃপর সেই স্বপ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করলেন।

বাদশাহ বললেনঃ আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় কি করে জানলেন! ইউসুফ আ. বললেন- এটা আমার, আপনার ও সকলের প্রভু-প্রতিপালক মহান আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন।

অতঃপর বাদশাহ পরামর্শ চাইলেন যে, এখন কি করা দরকার? ইউসুফ আ. বললেনঃ প্রথম সাতবছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে, জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে এবং উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছড়ার মধ্যে নিজের কাছে সঞ্চিত রাখতে হবে।

এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্যে মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভাণ্ডার মজুত থাকবে এবং আপনি তাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকবেন। এমতাবস্থায় রাজস্ব আয় ও

খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিনদেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। কারণ, এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূর দেশ অবধি বিস্তৃত। ভিনদেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য সেসব দিয়ে আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিত মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারী ধনভান্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগত হবে।

এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেনঃ এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে? ইউসুফ আ. তাকে যথাবিহিত পরামর্শ দিয়ে বললেন, পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে যা ব্যক্ত করা হয়েছে-

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

“আমাকে দেশের ধনভাণ্ডার নিযুক্ত করুন। আমি (আল্লাহর রহমতে) বিশ্বস্ত রক্ষক ও বেশ অভিজ্ঞ।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ৫৫)

অর্থাৎ জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করতে আমি সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি জ্ঞান আছে। (আল-জামি‘লি-আহকামিল কুরআন)

একজন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকা দরকার, উপযুক্ত দু‘টি শব্দের মধ্যে ইউসুফ আ. তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিলেন। কেননা, অর্থমন্ত্রীর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারী ধন-সম্পদ বিনষ্ট হতে না দেয়া; বরং পূর্ণ হিফাযত সহকারে একত্রিত করা এবং অনাবশ্যক ও ভ্রান্ত খাতে ব্যয় না করা । দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা দরকার, সেখানে সেই পরিমাণ ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোন কম-বেশী না করা। حَفِيظٌ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনীয় গুণ এবং عَلِيمٌশব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় গুণের নিশ্চয়তা বহন করছে।

বাদশাহ যদিও ইউসুফ আ. এর গুণাবলীতে মুগ্ধ ও তাঁর তাক্বওয়া ও বুদ্ধিমত্তায় পুরোপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি কার্যত তাঁকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোপর্দ করলেন না, বরং আরো বৃহত্তর উদ্দেশ্যে তাঁকে একবছর পর্যন্ত একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে রাজদরবারে রেখে দিলেন।

অতঃপর একবছর অতিবাহিত হওয়ার পর বাদশাহ শুধু অর্থমন্ত্রণালয়ই নয়, বরং সম্পূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁর নিকট সোপর্দ করে তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে দেন। সম্ভবত এই বিলম্বের কারণ ছিল এই যে, নিকট সান্নিধ্যে রেখে তাঁর চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে পুরোপুরি অভিজ্ঞতা সাধন-ই বাদশাহর উদ্দেশ্য ছিল।

কোন কোন তাফসীরবিদ লিখেছেনঃ এ সময়ই যুলাইখার স্বামী আযীযে মিসর কিতফীর মৃত্যুবরণ করেন এবং বাদশাহর উদ্যোগে ইউসুফ আ. এর সাথে যুলাইখার বিবাহ সম্পাদন করা হয়।

তখন ইউসুফ আ. যুলাইখাকে বললেন- তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চাইতে উত্তম নয়? যুলাইখা স্বীয় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাওবা করলেন।

আল্লাহ তা'আলা সসম্মানে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব সুখ-শান্তিতে তাঁদের দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত হয়। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী, তাদের ঔরশে দু'জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের নাম ছিল ইফরায়ীম ও মানশা।

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আ. এর অন্তরে যুলাইখার প্রতি এত গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন যে, যুলাইখার অন্তরে ততটুকু ইউসুফ আ. এর প্রতি ছিল না। এমনকি একবার ইউসুফ আ. যুলাইখাকে অভিযোগের সুরে বললেনঃ এর কারণ কি যে, পূর্বের ন্যায় আমাকে ভালবাসো না? উত্তরে যুলাইখা বললেনঃ আপনার উসীলায় আমি আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জন করেছি। এ ভালবাসার সামনে অন্যসব সম্পর্ক ও ভাবনা ম্লান হয়ে গেছে। (তাফসীরে মাযহারী)

তবে উল্লেখ্য যে, তাঁদের এ বিবাহের এসব ঘটনার স্বপক্ষে মজবুত কোন হাদীস নেই। সুতরাং এর উপর ততটা ইয়াক্বীন করা যায় না।

এক বছর হযরত ইউসুফ আ. রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাদশাহ রাজদরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। সেখানে রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণ আমন্ত্রিত হন। তখন হযরত ইউসুফ আ. কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং শুধু অর্থমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নয়, বরং গোটা রাজত্ব ইউসুফ আ. এর নিকট সোপর্দ করে বাদশাহ নির্জনবাসী হয়ে যান। (তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাযহারী)

কুরআন মাজীদের নিম্নলিখিত আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে- "এমনি করে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। তিনি তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারতেন। আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতপৌঁছে দেই এবং আমি নেককারদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৫৬)

দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর হযরত ইউসুফ আ. এমন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেন যে, কারো কোনো অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল এবং সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে ইউসুফ আ. কোনরূপ বাধা-বিপত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি। সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনার পাশাপাশি তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ আঞ্জাম দেন। বিশিষ্ট তাফসীরবিদ আল্লামা মুজাহিদ রহ. বলেনঃ এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দ্বারা ইউসুফ আ. এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধি-বিধান জারী করা এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা। তাই তিনি সর্বদা এ ব্যাপারে সজাগ ছিলেন এবং এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

জনগণের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইউসুফ আ. এমন কাজ করেন, যার নজীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যানুযায়ী সুখ-শান্তির সাতবছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ইউসুফ আ. পেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দেন। সবাই বললঃ মিসর সম্রাজ্যের যাবতীয় ধন-সম্পদ আপনার কব্জায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা? তিনি বললেন- সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সে জন্য এটা করি। সেই সাথে তিনি শাহী বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দেন-দিনে মাত্র একবার দুপুরের খাদ্য রান্না করবে, যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছুটা অংশগ্রহণ করতে পারে।

ইউসুফ আ. যেহেতু পূর্ব থেকেই জ্ঞাত ছিলেন যে, দুর্ভিক্ষ সাত বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে তিনি দেশের মজুদ শস্য-ভাণ্ডার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত রাখলেন। মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত করানো হল।

দেখতে দেখতে দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে বুভুক্ষা জনসাধারণ মিসরে আগমন করতে লাগল। তাদেরকে ইউসুফ আ. একটি বিশেষ পরিমাণে খাদ্যশস্য দিতেন; এর বেশী দিতেন না। ইমাম কুরতুবী রহ. এর পরিমাণ এক ওয়াসাক অর্থাৎ ষাট সা‘ লিখেছেন, যা আমাদের দেশীয় ওজন অনুযায়ী দু‘শ দশ সের (পাঁচ মণের কিছু বেশী হয় বা প্রায় ১৯৫ কেজি হয়)।

তিনি এ কাজটিতে এত গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি নিজেই করতেন। আর তখন শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং দূর-দূরান্ত অঞ্চলও এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল।

হযরত ইয়াকূব আ. এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা’ ‘খলীল’ নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, ও ইউসুফ আ. এর সমাধি অবস্থিত। এ এলাকাটিও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকূব আ. এর পরিবারেও অনটন দেখা দেয়।

সে সময় মিসরের এ সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে অনেক খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। তখন হযরত ইয়াকূব আ. এর কানে এ সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের বাদশাহ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি নিজেই স্বয়ং জনসাধারণের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। তাই তিনি পুত্রদের বললেনঃ তোমরা যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো।

এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দেয়া হয় না। তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠাতে মনস্থ করলেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ামীন ছিলেন ইউসুফ আ. এর সহোদর। ইউসুফ আ. নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে

ইয়াকূব আ. এর স্নেহ ও ভালবাসা তার প্রতিই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশুনার জন্য তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। খাদ্যশস্য আনার জন্য তাকে পাঠালেন না।

দশভাই কেনান থেকে মিসর পৌঁছল। ইউসুফ আ. শাহী পোশাকে রাজাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভ্রাতারা তাঁকে পথিক কাফেলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন, ঐ সাক্ষাতের সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী তাঁর বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছর। (তাফসীরে মাযহারী)

বলাবাহুল্য- এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের আকার-অবয়ব পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর ভ্রাতাদের ধারণায়ও একথা ছিল না যে, যেই বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রি করেছিল, সে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী বা বাদশাহ হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ইউসুফ আ. কে চিনল না। কিন্তু ইউসুফ আ. তাদেরকে চিনে ফেললেন। নিম্নোক্ত আয়াতে এ সর্ম্পকে বর্ণনা করা হয়েছে।

“ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা আগমন করল। অতঃপর তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তিনি তাদেরকে চিনে ফেললেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৫৮)

ইউসুফ আ. এর চিনে নেয়া সর্ম্পকে ইবনে কাসীর রহ. আরো বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই রাজদরবারে পৌঁছলে ইউসুফ আ. তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমন সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়। যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য কথা ব্যক্ত করে।

প্রথমত জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাতো হিব্রু। এমতাবস্থায় এখানে কিভাবে আসলে?

তারা বললঃ আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্য এখানে এসেছি।

দ্বিতীয়ত প্রশ্ন করলেনঃ তোমরা যে সত্য বলছো এবং তোমরা কোন শত্রুর চর নও, একথা কেমন করে বিশ্বাস করব? ভাইয়েরা বললঃ আল্লাহর পানাহ! আমাদের দ্বারা এরূপ কখনও হতে পারে না। আমরা আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকূব আ. এর সন্তান। তিনি কেনানে বসবাস করেন।

হযরত ইয়াকূব আ. ও তাঁর পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানা এবং ওদের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বিবৃত হোক-তাদেরকে প্রশ্ন করার পেছনে এটাই ছিল ইউসুফ আ. এর মূল লক্ষ্য। তাই এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন-তোমাদের পিতার আরো কোন সন্তান আছে কি?

তারা বললঃ আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাঁকেই সর্বাধিক আদর করতেন। এরপর তার ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। তাই তাকে আমাদের সাথে এ সফরে পাঠাননি। তাদের সব কথা শুনে ইউসুফ আ. তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন।

পূর্বেই বন্টনের ব্যাপারে ইউসুফ আ. এর এ রীতি ছিল যে, একবারে কোন এক ব্যাক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন। ভাইদের কাছ থেকে নিজ বাড়ীর সব বিবরণ জানার পর তাঁর মনে এরূপ আকাঙ্খা উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পুনর্বার আসুক। এজন্য একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং ভাইদেরকে বললেন,

“তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের ছোট সৎ ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। কেননা, তোমরাতো দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কিভাবে পুরোপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং উত্তম অতিথি আপ্যায়ন করি। (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৫৯)

এরপর তিনি ভাইদেরকে একটি সাবধান বাণীও শুনিয়ে দিলেন, “কিন্তু যদি তোমরা সেই সৎ ভাইকে সাথে নিয়ে না আস, তাহলে আমি তোমাদেরকে কোন খাদ্যশস্য দেব না এবং তোমরা আমার কাছেও আসবে না।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৬০)

ইউসুফ আ. অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি বা অলংকারাদি জমা দিয়েছিল, সেগুলো গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন। যাতে বাড়ী পৌঁছে তারা যখন আসবাবপত্র খুলবে এবং তাদের প্রদানকৃত মূল্য প্রত্যার্পিত দেখতে পাবে, তখন যেন সহজেই পুনর্বার খাদ্যশস্য নেয়ার জন্য আসতে পারে। নিম্নোল্লিখিত আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে-

“ইউসুফ আ. স্বীয় কর্মচারীদেরকে বললেনঃ তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদপত্রের মধ্যে রেখে দাও। এতে হয়ত তারা স্বজনদের কাছে পৌঁছে তা বুঝতে পারবে, যাতে তারা পুনরায় আসতে পারে।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৬২)

ইউসুফ আ. কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও যেন তাঁর সাক্ষাত ঘটার সুযোগ আসে।

ইউসুফ আ. এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও বললঃ মিসরের বাদশাহ আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেয়ার জন্য একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বিনয়ামীনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করবেন। এতে আমাদের খাদ্যশস্য

লাভের পথ সুগম হবে এবং তার কারণে বর্ধিত খাদ্যশস্য পাবো। আর আমরা আশ্বস্ত করছি যে, তার পুরোপুরি হিফাযত করব। তার কোন কষ্ট হবে না। নিম্নবর্ণিত আয়াতে বিষয়ে বিধৃত হয়েছে-

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾

“তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এলো, তখন তারা বললঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ব্যতীত খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব, আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন; যাতে আমরা খাদ্যশস্য বরাদ্দ পেতে পারি। আর আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হিফাযত করব।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৬৩)

ছেলেদের আবেদনের জবাবে ইয়াকুব আ. যা বললেন, তা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বিবৃত হয়েছেঃ

“তিনি বললেন- আমি কি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে সেরূপ বিশ্বাস করব, যেমন ইতোপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৬৪)

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পয়গাম্বরসূলভ তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে তিনি সম্মতি দিয়ে বললেন,“আল্লাহ তা‘আলা-ই উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু।”(সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৬৪)

এতক্ষন পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা সম্পর্কেই তাদের কথাবার্তা চলছিল। আসবাবপত্র তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হল এবং দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ পরিশোধিত নগদ অর্থকড়ি ও অলংকারাদি আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা অনুভব করতে পারল যে, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের পুঁজি তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে।

তখন তারা পিতাকে বললঃ আমরা আর কী চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার যাওয়া দরকার। কারণ, এ আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মিসরের বাদশাহ আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই চিন্তার কোন কারণ নেই। তাছাড়া ভাইকে সঙ্গে নিলে, তার অংশের বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাটি বিবৃত হয়েছে-

“যখন তারা তাদের আসবাবপত্র খুলল, তখন তারা তাতে নিজেদের পণ্যমূল্য প্রত্যার্পিত পেল। তারা তখন বললঃ হে আমাদের আব্বা! আমরা আর কী চাই? দেখুন, এই যে আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এখন আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য আবার রসদ আনব। আর আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং এক উটের বরাদ্দ খাদ্যশস্য আমরা অতিরিক্ত আনব। ঐ বরাদ্দ খুবই সহজ।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৬৪)

তাদের এসব কথা শুনে ইয়াকুব আ. যে উত্তর দিলেন, তা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে-

“তিনি বললেন, তাকে আমি ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৬৬)

উল্লেখ্য, সত্যাশ্রয়ীগণের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কখনো অন্তর্হিত হয় না যে, মানুষ বাহ্যত যত শক্তি-সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহ তা‘আলার শক্তির সামনে তারা নিতান্তই অপারগ ও অক্ষম। তারা কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে? কারণ, তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তাদের নেই। “ঐ অবস্থা ব্যতীত- যখন (ঘটনাক্রমে) তোমরা সবাই কোন বেষ্টনীতে আটকে যাও।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৬৬)

তাফসীরবিদ মুজাহিদ রহ. বলেনঃ এর অর্থ হচ্ছে-ঘটনাচক্রে তোমরা সবাই যদি মৃত্যুমুখে পতিত হও। ক্বাতাদাহ রহ. এর মতে এর অর্থ এই যে, যদি তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়। অর্থাৎ সেই অবস্থায় যেহেতু তোমরা অপারগ, তাই তখন বিনয়ামীন এর হিফাযতের দায়িত্বের ব্যাপারে ক্ষমার যোগ্য হবে।

ছেলেরা যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা অঙ্গীকার করল, তখন ইয়াকূব আ. সার্বিক বিষয় মহান আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করে বললেনঃ বিনয়ামীনের হিফাযতের ব্যাপারে হলফ নেয়া ও হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ তা‘আলার উপরই তার নির্ভরতা। তিনি শক্তি-সামর্থ্য দিলেই কেউ কারো হিফাযত করতে পারে এবং কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। নিম্নবর্ণিত আয়াতে এ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে-

“অতঃপর যখন তারা তাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিল, তখন তিনি বললেনঃ আমরা যা কিছু বলছি, তা আল্লাহরই কাছে সোপর্দ।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৬৬)

ছোট ভাই বিনয়ামীনকে নিয়ে যখন ইউসুফ এর ভ্রাতারা দ্বিতীয়বার মিসর সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল, তখন ইয়াকূব আ. তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর প্রাচীর কাছে পৌঁছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো।

এরূপ উপদেশ এজন্য দিয়েছিলেন যে, তারা ছিল স্বাস্থ্যবান, সুঠামদেহী, সুদর্শন ও রূপ-ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী। এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং পরস্পর ভাই ভাই, তখন কারো বদনজর লেগে তাদের ক্ষতি হতে পারে। অথবা সঙ্গবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে।

অবশ্য মহান আল্লাহর ওপর তাঁর পুরোপুরি ভরসা ছিল। তবে তাওয়াক্কুলের সাথে সাথে আসবাব ইখতিয়ার করাই তো কর্তব্য। তাই তিনি এ উপদেশ দিয়েছেন। কুরআন মাজীদের নিম্নোল্লেখিত আয়াতে এ সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে-

“ইয়াকুব আ. বললেনঃ হে আমার বৎসগণ! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।

অবশ্য আল্লাহ তা‘আলার কোন ফয়সালা থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি না। ফয়সালা তো কেবল আল্লাহরই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করি এবং তাঁরই ওপর ভরসা করা উচিত সকল ভরসাকারীর।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৬৭)

উল্লেখ্য, ইয়াকূব আ. এ সফরে বিনয়ামীনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় তদবীর গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁকে আশাহত হতে হয়েছে। কেননা অন্য এক ঘটনাসূত্রে বিনয়ামীনকে মিসরে আটক রাখা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

“তারা যখন পিতার কথামত প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ তা‘আলার ফয়সালার বিপরীত তা তাদের কোন কাজে আসল না। কিন্তু ইয়াকূব আ. তাঁর মনের একটি বাসনা পূর্ণ করেছিলেন মাত্র। (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৬৮)

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে তদবীর ব্যর্থ হয়েছে, যদিও আশঙ্কাকৃত কুদৃষ্টি, হিংসা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে যে ঘটনা অনিবার্য ছিল, তা সংঘটিত হয়েছে। তবে তদবীরের এ বাহ্যিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের ওপর ভরসা করার বরকতে পরবর্তীতে এ দ্বিতীয় আঘাত প্রথম আঘাতের প্রতিকার প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিণামে পরম নিরাপত্তা ও ইজ্জতের সাথে ইউসুফ ও বিনয়ামীন এর সাথে ইয়াকুব আ. এর সাক্ষাত লাভ হয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসছে।

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা মিসরে প্রবেশ করে ইউসুফ আ. এর নিকটে গেল। ইউসুফ আ. তাদেরকে ছোট ভাই বিনয়ামীনকে সাথে দেখে খুব খুশী হলেন এবং তাদের উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন।

অতঃপর ইউসুফ আ. ছোট ভাই বিনয়ামীনকে বিশেষ একটি হিকমতের মাধ্যমে নিজের সাথে রেখে দিলেন। সেই হিকমত সম্পর্কে বিশিষ্ট তাফসীরবিদ ক্বাতাদাহ রহ. বলেনঃ সব ভাইদের থাকার ব্যবস্থা করে ইউসুফ আ. প্রতি দু’জনকে একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বিনয়ামীন একা থেকে গেল। তখন ইউসুফ আ. তাকে নিজের সাথে অবস্থান করতে বললেন।

সেখানে যখন উভয়ই একান্তে মিলিত হলেন, তখন ইউসুফ আ. বিনয়ামীনের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেনঃ আমি তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ। এখন তোমার

কোন চিন্তা নেই। অন্য ভাইয়েরা এ যাবত যে দুর্ব্যবহার করেছিল, তজ্জন্যে মনোকষ্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। নিম্নোল্লেখিত আয়াতে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

“যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন তিনি আপন ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখলেন। আর বললেনঃ নিশ্চয় আমি তোমার সহোদর ভাই। অতএব, তারা যা করেছিল-সেজন্য দুঃখ করো না।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৬৯)

এরপর ইউসুফ আ. বিনয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দেয়ার এবং ভাইদের বিনয়ামীনকে ছাড়া-ই বিদায় করার মনস্থ করলেন। সেজন্য এই কৌশল অবলম্বন করলেন যে, যখন সব ভাইকে নিয়মমাফিক খাদ্যশস্য দেয়া হল, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হলো এবং সে সময় বিনয়ামীনের নামে যে খাদ্যশস্য উটের পিঠে উঠানো হল, তাতে বাদশাহর একটি পাত্র গোপনে রেখে দেয়া হল। কুরআনে পাক এ পাত্রটিকে এক জায়গায় السِقايَة শব্দ দ্বারা এবং অন্যত্র صُوَاعَ المَلِكِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

السِقايَة শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং صُوَاعَ শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

একে المَلِكِ তথা বাদশাহর দিকে সম্পৃক্ত করার ফলে বিশেষভাবে বোঝা গেল যে, এ পাত্রটি বেশ মূল্যবান ছিল। কোন কোন রিওয়ায়াতে রয়েছে-পাত্রটি ‘যবরজদ’ পাথর দ্বারা তৈরীকৃত ছিল। আবার কেউ কেউ স্বর্ণনির্মিত এবং কেউ রৌপ্য নির্মিতও বলেছেন।

বিনয়ামীনের রসদপত্রে গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহর সাথে এটি সম্পৃক্ত হওয়ায় এর এ বিশেষত্ব প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাদশাহ নিজে এটা ব্যবহার করতেন, কিংবা বাদশাহর আদেশে তা খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হত।

অতঃপর ইউসুফ আ. এর ভাইদের কাফেলা যখন প্রত্যাবর্তনের জন্য রওয়ানা হল, তখন জনৈক ঘোষক ডেকে বললঃ “হে কাফেলার লোকজন! আপনারা চোর।” কুরআনে হাকীমের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে- “অতঃপর যখন ইউসুফ আ. তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলেন, তখন পানপাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করে বললঃ হে কাফেলার লোকজন! আপনারা নিশ্চয় চোর।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৭০)

ইউসুফ আ. এর ভ্রাতারা ঘোষণাকারীদের ঘোষণা শুনে আশ্চর্য হয়ে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, “তোমরা আমাদেরকে চোর বলছ! প্রথমে একথা আমাদেরকে বল যে, তোমরা কী বস্তু হারিয়েছ?” ঘোষণাকারীরা বললঃ “আমরা বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছি এবং যে কেউ তা এনে দেবে, সে এক-উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে। এ ব্যাপারে আমি এর যামিন।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৭২)

তখন ইউসুফ আ. এর ভ্রাতারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বলল, “আল্লাহর কসম! আপনারা তো অবশ্যই জানেন, আমরা কিছুতেই এ দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৭৩)

তখন রাজকর্মচারীরা জব্দ করে বলল, “যদি আপনারা মিথ্যাবাদী হন, তাহলে তার শাস্তি কী হবে?” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৭৪)

তখন নিজেদের দেশের কানুন বর্ণনা করে ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা বলল, “এর শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদান সে নিজেই হবে। এভাবেই আমরা জালিমদের শাস্তি দেই।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৭৫)

অর্থাৎ হযরত ইয়াকূব আ. এর শরী‘আতে চোরের শাস্তি এই ছিল যে, চোর যার মাল চুরি করবে, সে চোরকে গোলাম বানিয়ে রাখবে।

রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভ্রাতাদের মুখ থেকে ইয়াকূবী শরী‘আত অনুযায়ী চোরের শাস্তি ব্যক্ত করলো, যাতে বিনয়ামীনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলে, তারা নিজেরাই ফয়সালা অনুযায়ী বিনয়ামীনকে ইউসুফ আ. এর হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়।

অতঃপর সরকারী কর্মচারীরা ইউসুফ আ. এর ভাইদের আসবাবপত্র তল্লাশী করতে লাগল। তারা তাদের কৌশলের ব্যাপারটিকে আড়াল করার জন্য এবং সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য প্রথমেই বিনয়ামীনের রসদপত্রে তল্লাশী করলো না, বরং শুরুতে অন্য ভাইদের রসদপত্রে তল্লাশী করলো। যাতে এ নিয়ে তাদের মনে কোন খটকা না লাগে। সর্বশেষে বিনয়ামীনের রসদপত্র তল্লাশী করা হলে, তা থেকে শাহীপাত্রটি বের হল।

পবিত্র কুরআনের নিম্নোল্লেখিত আয়াতে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে-

“অতঃপর ইউসুফ আ. আপন ভাইয়ের থলের পূর্বে তাদের (অন্য ভাইদের) থলে তল্লাশী করলেন। অবশেষে আপন ভাইয়ের থলে তল্লাশী করে সেখান থেকে পানপাত্রটি বের করলেন।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৭৬)

তখন ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা হতভম্ব হয়ে গেল। তাদের বড় গলা রইল কোথায়? তাই লজ্জায় তাদের মাথা নীচু হয়ে গেল এবং তারা বিনয়ামীনকে গাল-মন্দ করে বললঃ তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে!

এ ঘটনার পূর্বেই ইউসুফ আ. বিনয়ামীনকে স্বীয় কৌশলের ব্যাপারে অবগত করেছিলেন। তাই বিনয়ামীন উক্ত ঘটনায় কোনরূপ বিচলিত হলেন না এবং ভাইদের তিরস্কারের প্রেক্ষিতেও কোনো প্রতি উত্তর করলেন না।

বিনয়ামীনের রসদপত্র থেকে পাত্রটি বের হওয়ায় ইউসুফ আ. ইয়াকূবী শরী'আত অনুযায়ী বিনয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। তিনি সে দেশের বাদশাহর আইন অনুযায়ী তাকে রাখতে পারতেন না। কেননা, মিসরে আইনে চোরকে মারপিট করে এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেয়ার বিধান ছিল। তাই যাতে তার ক্ষেত্রে ইয়াকূবী শরী'আত অনুযায়ী ফয়সালা করা যায়, সে জন্য পূর্বেই ভ্রাতাদের মুখ থেকে ইয়াকুব আ. এর দেশের রীতি অনুযায়ী ফয়সালা করার অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছিলেন।

সেই অনুযায়ী বিনয়ামীনকে আটকে রাখা বিধিসম্মত হল। এভাবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় ইউসুফ আ. এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

নিম্নোক্ত আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে-

"এমনিভাবে আমি ইউসুফ আ. এর জন্য বিশেষ কৌশল সৃষ্টি করে দিলাম। তিনি বাদশাহর আইনে কখনও আপন ভাইকে আটকে রাখতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ৭৬)

এ পর্যায়ে ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বললঃ সে যদি চুরি করে থাকে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, তার এক সহোদর ভাইও ইতোপূর্বে চুরি করেছিল। নিম্নোক্ত আয়াতে একথা বিবৃত হয়েছে-

"তারা বললঃ সে যদি চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও তো ইতোপূর্বে চুরি করেছিল।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ৭৭)

এভাবে ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা স্বয়ং ইউসুফ আ. এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল! এতে ইউসুফ আ. এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। সেই ঘটনা হচ্ছে এখানে বিনয়ামীনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যেভাবে কৌশল করা হয়েছে, তখনও হুবহু এমনিভাবে ইউসুফ আ. এর বিরুদ্ধেও তারা অজান্তে চুরির অপবাদ দ্বারা চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই ভ্রাতারা ভালভাবেই জানত যে, উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে ইউসুফ আ. সম্পূর্ণ নির্দোষ। বরং যারা অপবাদ দিয়েছে, তারা-ই কুচক্রী। কিন্তু এখন বিনয়ামীনের প্রতি আক্রোশের বশে সেই ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে ইউসুফআ. কে তাতে অভিযুক্ত করে দিল।

সেই চুরির অপবাদের ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়াত রয়েছে। ইমাম ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ., হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদ রহ. এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইউসুফ আ. এর জন্মের পর কিছুকালের মধ্যেই বিনয়ামীন জন্মগ্রহণ করে। তাকে প্রসবের পর তাদের জননীর মৃত্যু হয়। তাতে ইউসুফ ও বিনয়ামীন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়েন। তখন তাদের লালন-পালন ফুফুর কোলে সম্পন্ন হতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ আ. কে শিশুকাল থেকেই এমন অপরূপ সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাঁকে যে-ই দেখত, সে-ই তাঁর সীমাহীন স্নেহ-মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেত। ফুফুর অবস্থাও ছিল তা-ই। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না। এদিকে পিতা হযরত ইয়াকূব আ. এর অবস্থাও এর চাইতে কম ছিল না। কিন্তু ছোট্ট শিশু হওয়ার কারণে কোন মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকা জরুরী বিধায় তাঁকে ফুফুর হাতে সমর্পণ করে দেন।

অতঃপর ইউসুফ আ. যখন চলাফেরার বয়সে পৌঁছলেন, তখন পিতা ইয়াকূব আ. তাঁকে নিজের কাছেই রাখতে চাইলেন। ফুফুকে একথা জানালে প্রথমে তিনি আপত্তি করলেন। অতঃপর অধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইউসুফ আ. কে তাঁর পিতার হাতে সমর্পণ করলেন।

কিন্তু বাহ্যতঃ তাকে দিলেও মন থেকে তাকে দূরে রাখতে পারছিলেন না। তাই কোন কৌশলে তাকে ফেরত নেয়ার জন্য গোপনে একটি ফন্দি আঁটলেন। ফুফু স্বীয় পিতা হযরত ইসহাক আ. এর কাছ থেকে একটি হার পেয়েছিলেন। এটি অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। ফুফু এই হারাটিই এক সময়ে চুপিসারে ইউসুফ আ. এর জামার নীচে কোমরে বেঁধে দিলেন। কিয়ৎপরে হযরত ইউসুফ আ. গেলে, ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার হারটি চুরি হয়ে গেছে। তখন তল্লাশী করার পর ইউসুফ আ. এর কাছ থেকে তা বের হল। তাতে ইয়াকুবী শরী'আতের বিধান অনুযায়ী, ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে নিজের নিকট রাখার অধিকার পেলেন।

ইয়াকূব আ. যখন দেখলেন যে, আইনগত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, তখন তিনি দ্বিরুক্তি না করে ইউসুফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ইয়াকূব আ. ইউসুফ আ. কে ততদিন ফুফুর কাছেই রেখেছিলেন। ফুফুর মৃত্যুর পর ইউসুফ আ. কে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

এ ছিল সেই ঘটনা, যাতে ইউসুফ আ. মিথ্যা চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর বিভিন্ন ঘটনায় সবার কাছেই এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইউসুফ আ. তো চুরি করেনইনি, এমনকি তাঁর চরিত্র এমন নিষ্কলুষ যে, সে ধরনের কোন সন্দেহ থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন। বরং ফুফুর আদরই তাঁকে ঘিরে এ চক্রান্তজাল সৃষ্টি করেছিল।

এ সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। তাই ইউসুফ আ. কে কোন চুরির ঘটনার সাথে জড়িত করা তাদের পক্ষে কিছুতেই উচিত ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে তাদের বৈরিভাব অদ্যাবধি বিরাজমান ছিল। সেই সাথে তাঁর সহোদর ভাইয়ের (কল্পিত) চুরির ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যার কারণে ইউসুফ আ. এর প্রতি চুরির অপবাদ তাদের মুখ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল।

ইউসুফ আ. ভাইদের একথা শুনে তা মনে মনেই রাখলেন। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে-

“ইউসুফ আ. (তা শুনেও) প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলেন এবং তাদের কাছে ব্যক্ত করলেন না।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৭৭)

তবে তখন তিনি মনে মনে এ কথা বললেন, “তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ। অবশ্যই আল্লাহ খুব জ্ঞাত রয়েছেন সে ব্যাপারে, যা তোমরা বর্ণনা করছ।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৭৭)

এখানে দু‘টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়। প্রথম প্রশ্ন হয় এই যে, ইউসুফ আ. বিনয়ামীনকে আটকানোর জন্য এ কৌশল কেন করলেন? অথচ তিনি জানতেন যে, একেতো স্বয়ং তাঁর বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্য অসহনীয় ছিল, এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে রাখলে তার বিচ্ছেদে পিতা আরো শোকাতুর হয়ে যাবেন। সুতরাং তিনি তা কিরূপে বিবেচনা করলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ, তা এই যে, নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা হল এবং তা প্রমাণে গোপনে বিনয়ামীনের আসবাবপত্রের মধ্যে বিশেষ পাত্র রেখে দেয়া হল, আর প্রকাশ্যে তাদেরকে চোর বলে লাঞ্ছিত করা হল। অথচ সন্দেহ নেই যে, এসব কাজ সম্পূর্ণ অবৈধ। সুতরাং আল্লাহর পয়গাম্বর ইউসুফ আ. এগুলো কী করে করলেন?

এর জবাব আল্লামা কুরতুবী রহ. সহ কোন কোন মুফাসসির এটা বর্ণনা করেছেন যে, বিনয়ামীন যখন ইউসুফ আ. কে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে, তাকে যেন অন্য ভাইদের সাথে ফেরত পাঠানো না হয়; বরং তাঁর কাছেই যেন রাখা হয়। তখন হযরত ইউসুফ আ. প্রথমে এ অজুহাত পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করে আটকে রাখা। কিন্তু বিনয়ামীন সেই ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ ধরনের অবস্থাকেও গ্রহণ করে নিলো।

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকষ্ট, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর বলা শুধু বিনয়ামীনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না।

তাই কেউ কেউ এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, ঘোষক বোধ হয় ইউসুফ আ. এর অজ্ঞাতসারে এবং তাঁর বিনা অনুমতিতে ভাইদেরকে চোর বলেছিল। কিন্তু এ অভিমত যেমন প্রমাণহীন, তেমনি ঘটনার সাথে অসংলগ্ন।

আবার কেউ কেউ কারণ বর্ণনা করে বলেন যে, ভ্রাতাগণ ইউসুফ আ. কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়।

অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তা-ই যা আল্লামা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ তাফসীরকারগণ জোরালোভাবে দিয়েছেন। তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে, তা বিনয়ামীনের ইচ্ছার ফলশ্রুতি ছিল না এবং ইউসুফ আ. এর প্রয়াসের ফলও ছিল না; বরং এসব ছিল মহান আল্লাহর নির্দেশে তারই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ। এসব কাজের মাধ্যমে ইয়াকুব আ. এর পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর পূর্ণতা লাভ করেছিল। এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে- "আমি ইউসুফের খাতিরে এমনিভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করে দিয়েছি।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৭৬)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কৌশলকে পরিষ্কারভাবে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহর নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে তখন এগুলোকে অবৈধ বলার কোন অবকাশ নেই। এ পর্যায়ে এগুলোকে হযরত মূসা আ. এর সামনে হযরত খিজির আ. কর্তৃক নৌকা ভাঙ্গা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতই শুধু মাত্র আল্লাহর কাজ ছিল বলেই মূসা আ. তা মেনে নিতে পারছিলেন না এবং প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু খিজির আ. সব কাজ আল্লাহর নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার আওতায় করে যাচ্ছিলেন। তদ্রূপ এগুলোও প্রকৃতপক্ষে ইউসুফ আ. এর জন্য গুনাহের কাজ ছিল না। বরং মহান আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন ছিল।

হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা একটি নিদর্শন।

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা যখন দেখল যে মুক্তির কোন উপায়-ই নেই এবং বিনয়ামীনকে বাদশাহ রেখে দিতেই মনস্থ করেছেন, তখন অন্যভাবে তারা বিনয়ামীনকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল। তারা বাদশাহর দরবারে আবেদন জানিয়ে বলল, কুরআন পাকের নিম্নবর্ণিত আয়াতে যা বিবৃত হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

"হে আযীয। তার পিতা খুবই বয়োঃবৃদ্ধ। (তিনি এ ছেলেকে খুব আদর করেন) সুতরাং আপনি তাকে ছেড়ে দিয়ে তার বদলে আমাদের একজনকে রেখে দিন। আমরা তো আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন জ্ঞান করছি।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৭৮)

ভাইদের আবেদন শুনে ইউসুফ আ. তাদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন-

قَالَ مَعَاذَ اللَّـهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ﴿٧٩﴾

"আল্লাহর পানাহ চাই যে, যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে গ্রেফতার করব। তাহলে তো আমরা জালিম বলেই গণ্য হব।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৭৯)

ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা যখন বিনয়ামীনের মুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা পরস্পর পরামর্শ করার জন্য একটি পৃথক জায়গায় একত্রিত হল। আলোচনার এক পর্যায়ে তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলল, "তোমাদের কাছ থেকে

বিনয়ামীনকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? আর তোমরা তো ইতোপূর্বেও ইউসুফের ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ।

সুতরাং আমি কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না- যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য কোন ফয়সালা প্রদান করেন। তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৮০)

এরপর বড় ভাই বললেন, "তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং গিয়ে তাকে বল যে হে আব্বাজান। আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি-তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা। আর অদৃষ্ট সম্বন্ধে তো আমরা জ্ঞাত ছিলাম না।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৮১)

আলোচ্য আয়াতে "আর অদৃষ্ট সম্বন্ধে তো আমরা জ্ঞাত ছিলাম না" বাক্যের মর্মার্থ হল- আমরা আপনার কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বিনয়ামীনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। কিন্তু আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থার বিচার। অদৃষ্টের খবর তো আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব।

আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, আমরা ভাই বিনয়ামীনের যথাসাধ্য হিফাযত করেছি, যাতে সে কোনভাবে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ করবে এবং আটক হবে- তা আমাদের জানা ছিল না।

কথামতো ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা সেভাবেই পিতাকে গিয়ে বলল। তদুপরি যেহেতু তারা ইতোপূর্বে পিতাকে একবার ধোঁকা দিয়েছিল, ফলে তারা জানত যে তাদের এ কথায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাই তারা তাদের কথাকে জোরালো করার জন্য বলল, "আপনি জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের বাসিন্দাদেরকে- যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে- যাদের সাথে আমরা এসেছি। নিশ্চিতই আমরা সত্যবাদী" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৮২)

ইতোপূর্বে যেহেতু ইউসুফ আ. এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল, তাই এবারও ইয়াকূব আ. তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারলেন না যদিও এবার তারা তাদের জানা অনুযায়ী বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এক্ষেত্রেও ইয়াকূব আ. ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা ইউসুফ আ. এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন, "কিছুই না, বরং তোমরা মনগড়া একটি কথা সাজিয়ে নিয়ে এসেছ। এখন পূর্ণ ধৈর্যধারণই উত্তম।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৮৩)

এ ঘটনায় ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা সত্য কথা বলা সত্বেও হযরত ইয়াকূব আ. পূর্বের ন্যায় মন্তব্য করলেন। এর দ্বারা বোঝা যায়-কোন নবী-রাসূলগণ গায়েব জানেন না।

উল্লেখিত বাক্যটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, মনগড়া কথা বলে ইয়াকূব আ. ঐ কথা বুঝিয়েছেন যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে বিনয়ামীনকে গ্রেফতার করে নেয়া হয়েছিল। আর তোমাদের পক্ষ থেকে সেই চুরির সমর্থন যোগান হয়েছিল, যা ছিল মিথ্যা।

অবশ্য এক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের বিনিময়ে ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকার পাওয়ার ব্যাপারে ইয়াকুব আ. আশান্বিত হলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে- (ইয়াকুব আ. বললেন)- আশা করা যায় যে, সম্ভবত শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৮৩)

অতঃপর দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকূব আ. এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে মহান পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন। আর পূর্বের স্মৃতিচারণ করে ইউসুফ আ. এর জন্য দিলের ব্যাকুলতা প্রকাশ করে বললেন-

يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ

"হায় আফসোস- ইউসুফের জন্যে" এভাবে দুঃখেও অশ্রু বিসর্জনে তাঁর চক্ষু বিবর্ণ হয়ে গেল। নিম্নোক্ত আয়াতে তা ব্যক্ত করা হয়েছে- وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

"আর দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৮৪)

তার চোখ সাদা বর্ণ ধারণ করার অর্থ হচ্ছে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল।
তাফসীরবিদ মুকাতিল রহ. বলেন, ইয়াকূব আ. এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। فَهُوَ كَظِيمٌ

অর্থ- "তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।" অর্থাৎ কারো কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না كَظِيمٌ শব্দটি كظم থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ-বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তাঁর মন নির্মোহ হয়ে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারও কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না।

ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা ও ইউসুফের জন্য আকুতি দেখে বলতে লাগল, "আল্লাহর কসম, আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত হবেন না যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা নিঃশেষ না হন।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৮৫)

ইয়াকূব আ. ছেলেদের কথা শুনে বললেন,"আমি তো আমার দুঃখ ও বেদনা আল্লাহ তা'আলা সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর তরফ থেকে আমি যা জানি- তোমরা তা জান না।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৮৬)

মহান আল্লাহর তরফ থেকে নিশ্চয়ই ইয়াকূব আ. ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন- "আমি আল্লাহর তরফ থেকে যা জানি, তোমরা তা জান না।"

এরপর সেই সূত্রেই হযরত ইয়াকুব আ. ছেলেদের বললেন, "বৎসরা! যাও ইউসুফ ও তাঁর ভাইকে খোঁজ কর এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত থেকে কাফের গোষ্ঠী ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৮৭)

ইয়াকূব আ. এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। ইতিপূর্বে কখনও তিনি এমন আদেশ দেননি। এটা তাকদীরেরই ব্যাপার। এর পূর্বে তাদেরকে পাওয়ার কোন আভাস তাঁর মনে উদয় হয়নি। তাই এরূপ কোন নির্দেশ তিনি দেননি। এখন সেই আভাস ও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার পর তিনি সেই নির্দেশ দিলেন।

এক্ষেত্রে বিনয়ামীনকে পাওয়ার স্থান- তো নিদিষ্ট-ই ছিল। তা ছিল মিসর-যেখানে তাকে আটক রাখা হয়েছে। সেই সাথে ইউসুফ আ. কে ও খোঁজার সিদ্ধান্ত হল। ওদিকে পরিবারের জন্য খাদ্য আনারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই সব উদ্দেশ্য মিলিয়ে ইয়াকুব আ. ছেলেদেরকে পুনঃত মিসরে পাঠালেন।

কেউ কেউ বলেনঃ আযীয মিসর কর্তৃক ছেলেদের রসদপত্রের মধ্যে পণ্য ফেরত দেয়ার ঘটনা থেকে ইয়াকূব আ. প্রথমবার আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এই আযীযে মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু ব্যাক্তি। বিচিত্র নয় যে, তিনিই হয়ত তাঁর হারানো ইউসুফ। দ্বিতীয়ত বিনয়ামীনকে তাঁর রেখে দেয়ার দ্বারা এ সম্ভাবনা প্রবল হল।

ইউসুফ ভ্রাতারা যখন পিতার নির্দেশ মুতাবিক মিসরে পৌঁছল এবং আযীযে মিসরের সাথে সাক্ষাত করল, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল এবং নিজেদের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলল-

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّـهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

"হে আযীয। আমরা ও আমাদের পরিজনবর্গ নিদারুন কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অতি নগণ্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। এমতাবস্থায় আমরা অনুরোধ করছি আপনি আমাদের রসদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দানকারীদেরকে পুরষ্কৃত করে থাকেন।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৮৮)

এখানে بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ “অতি নগণ্য পুঁজিকে আরেক অর্থে কেউ কেউ ‘অচল পুঁজি’ বলেছেন। অকেজো বস্তুগুলো কি ছিল, কুরআন ও হাদীসে তার কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তবে এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রকম। কেউ বলেন- এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা, যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন- ঘরে ব্যবহারযোগ্য কিছু মামুলী আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে مُّزْجَاةٍ শব্দের ব্যাখ্যা। এর আসল অর্থ এমন বস্তু- যা নিজে সচল নয়, বরং জোরজবরদস্তি করে সচল করা হয়।

ইউসুফ আ. ভাইদের এহেন মিসকীন সুলভ কথাবার্তা শুনে এবং দুরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ আ. এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধি নিষেধ ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল।

তাফসীরে কুরতুবী ও তাফসীরে মাযহারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর রিওয়ায়াতে এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় হযরত ইয়াকূব আ. আযীযে মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পত্রটির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপঃ

“ইয়াকুব সফিউল্লাহ ইবনে ইসহাক যাবীহুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পক্ষ থেকে আযীযে মিসর সমীপে আরজ-

বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের অংশবিশেষ। নমরুদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা ইসহাকেরও কঠোর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। তার বিরহ ব্যথায় আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছে।

তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের সান্তনার একমাত্র সম্বল, যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গম্বরগণের সন্তান-সন্ততি, আমরা কখনও চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। ওয়াসসালাম।”

পত্র পাঠ করে হযরত ইউসুফ আ. কেঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে পরলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন।

পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ইউসুফ আ. নিজ ভাইদেরকে প্রশ্ন করলেন, “তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছিলে যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞতার মধ্যে? (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৮৯)

এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ ভ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আযীযে মিসরের কি সম্পর্ক। অতঃপর তারা এ বিষয়টি ও ভেবে দেখল যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কোন এক সময় ইউসুফ অনেক উচ্চ

মর্তবায় পৌঁছাবে এবং তার সামনে আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব, এ আযীযে মিসরই কি স্বয়ং ইউসুফ। এরপর আরও চিন্তা-ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা তারা ইউসুফকে চিনে ফেলল এবং বিস্তারিত তথ্য জানার জন্যে জিজ্ঞেস করল-"সত্যি সত্যিই কি আপনি ইউসুফ।"

জবাবে ইউসুফ আ. বললেন- "হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৯০)

ভাইয়ের প্রসঙ্গটি এজন্যে জুড়ে দিলেন, যাতে করে তাদের লক্ষ্য অর্জনের পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দু'জনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল, তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান হয়েছে।

এরপর ইউসুফ আ. আরো বললেন, "আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে ব্যাক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে আল্লাহ পাক এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৯০)

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ আ. এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া ছাড়া ইউসুফ ভ্রাতাদের উপায় ছিল না। তাই তারা সবাই একযোগে বলে উঠল, "আল্লাহর কসম। নিঃসন্দেহে তিনি আপনাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং অবশ্যই আমরা ছিলাম অপরাধী।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৯১)

ভাইদের কথার উত্তরে ইউসুফ আ. পয়গম্বরসূলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন,

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৯২)

অর্থাৎ তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমি কোন অভিযোগ উত্থাপন করব না।

এ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর তিনি ভাইদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমার জন্য দু'আ করে বললেন- "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (অন্যায়) ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৯৩)

এরপর ইয়াকূব আ. এর প্রতি মনোনিবেশ করে তিনি বললেন, "তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার আব্বার চেহারার উপর রেখে দিও, এতে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে-তাঁর ভাইদের মধ্যে ইয়াহুদা বললঃ এই জামা আমি নিয়ে যাব। কারণ, তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এখন এর ক্ষতিপূরণ আমার হাতেই হওয়া উচিত।

ইউসুফ ভ্রাতাগণের কাফেলা মিশর শহর থেকে বের হতেই ওদিকে কেনানে ইয়াকূব আ. নিকটে উপস্থিত লোকদেরকে বলতে লাগলেন, “যদি তোমরা আমাকে প্রলাপোক্তিকারী মনে না কর, তবে শোন, আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৯৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা অনুযায়ী মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত আটদিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরী রহ: এর বর্ণনা মতে, আশি ফরসাখ অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ, মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ তা‘আলা এত দূর থেকে ইউসুফ আ. এর জামার মাধ্যমে তাঁর গন্ধ ইয়াকূব আ. এর মস্তিষ্কে পৌঁছে দেন। এটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে। অথচ ইউসুফ আ. যখন কোনানেরই এক কুপের ভিতরে তিন দিন পড়ে রইলেন, তখন ইয়াকুব আ. এ গন্ধ অনুভব করেননি। এ থেকেই বোঝা যায় যে, পয়গাম্বরগণের নিজস্ব কর্মকাণ্ড নয়, বরং সরাসরি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তা তার নির্দিষ্ট সময়েই আসে।

হযরত ইয়াকূব আ. এর কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা বলল, “আল্লাহর কসম, আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে। (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ ৯৫)

ভ্রাতারা কেনানে পৌঁছে যখন স্বীয় পিতার কাছে ইউসুফ ও বিনয়ামীনকে পাওয়ার সুসংবাদ দিল এবং ইউসুফ আ. এর জামা ইয়াকূব আ. এর চেহারা মুবারকে রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। এ সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা।

এরপর ইয়াকূব আ. বললেন আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি যা তোমরা জান না? অর্থাৎ ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে আমি মিলিত হবো-এ আভাস আমি আগেই ওহীর মাধ্যমে পেয়েছি।

নিম্নোলিখিত আয়াতে এ কথাটিই ব্যাক্ত করা হয়েছে-
“অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা এলো, তখন সেই জামাটি তাঁর চেহারায় রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। তখন তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে আমি যা জানি-তোমরা তা জান না?” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৯৬)

বাস্তব ঘটনা যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফ আ. এর ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল,

“হে আব্বাজান। আমাদের জন্য ক্ষমার দু‘আ করুন। আমরা নিশ্চিত অপরাধী ছিলাম।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৯৭)

ছেলেদের আবেদনের জওয়াবে হযরত ইয়াকূব আ. বললেন, “আমি অতিসত্বর তোমাদের জন্য আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৯৮)

হযরত ইয়াকূব আ. এখানে তৎক্ষণাত দু‘আ করার পরিবর্তে অতিসত্বরই দু‘আ করার ওয়াদা করেছেন। তাফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল-বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পর দু‘আ করবেন। কেননা, তখনকার দু‘আ বিশেষভাবে কবুল হয়।

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে যে, ইউসুফ আ. ভাইদের সাথে দুইশত উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্যে ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে।

হযরত ইউসুফ আ. সর্ম্পকে বিস্তারিত জেনে পিতা হযরত ইয়াকুব আ. ছেলেদেরকে ও পরিবারের সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি সকলকে নিয়ে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী, তাদের সংখ্যা ছিল বাহাত্তর জন। আরেক রিওয়ায়াত অনুযায়ী, তারা তিরানব্বইজন পুরুষ ও মহিলা ছিলেন।

ইয়াকূব আ. মিসরে পৌঁছার নিকটবর্তী হলে, ইউসুফ আ. ও মিসরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের অভ্যর্থনার জন্য বাইরে গমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাই ও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে জমায়েত হল।

হযরত ইয়াকূব আ. সকলকে নিয়ে মিসরের উপকণ্ঠে পৌঁছলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর পর ইউসুফ আ. বাবা মাকে একান্ত করে নিলেন এবং সবাইকে বললেন- আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে মিসরে প্রবেশ করুন। অর্থাৎ ভিনদেশীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে স্বভাবত যেসব বিধি-নিষেধ থাকে, সেগুলো থেকে তাদেরকে মুক্ত ঘোষণা করলেন।

কুরআন মাজীদের নিম্নোল্লিখিত আয়াতে একথা বিবৃত হয়েছে-

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ ﴿٩٩﴾

“তারা যখন ইউসুফ আ. এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং বললেন-আল্লাহ চাহেন তো আপনারা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ৯৯)

অতঃপর হযরত ইউসুফ আ. পিতা-মাতাকে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসালেন। এ সময় পিতা-মাতা ও ভ্রাতাগণ সবাই ইউসুফ আ. এর সামনে সিজদা করলেন। তখন ইউসুফ আ. ইয়াকূব আ. কে বললেন-আব্বাজান! এটাই আমার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা-যা আমি দেখেছিলাম যে, এগারটি তারা এবং সূর্য ও চন্দ্র আমার জন্য সিজদা করছে। পবিত্র কুরআনে এ সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে-

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ

“এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন। তখন সবাই তার সামনে সিজদাবনত হলেন। ইউসুফ আ. বললেনঃ হে আমার আব্বাজান! এ হল আমাদের পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার পালনকর্তা তাকে সত্যে পরিণত করেছেন।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ১০০)

উপরোল্লিখিত আয়াতে أَبَوَيْهِ বলে পিতা-মাতা উভয়জনের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইউসুফ আ. এর মাতা-তাঁর শৈশবেই ইন্তিকাল করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তারপর ইয়াকূব আ. ইউসুফ আ. এর মাতার ভাগিনী লাইয়্যাকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি ইউসুফ আ. এর খালা হওয়ার দিক দিয়ে মায়ের মতই ছিলেন, আবার পিতার বিবাহিত স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতাই ছিলেন। তাই আয়াতে তাদেরকে أَبَوَيْهِ (মা-বাবা) বলা হয়েছে। وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا

“সবাই হযরত ইউসুফ আ. এর সামনে সিজদা করলেন।” এ আয়াতে বর্ণিত উক্ত সিজদা সর্ম্পকে রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এ সিজদাটি ছিল কৃতজ্ঞতাসূচক। আর এটা ইউসুফ আ. এর জন্য নয়, বরং আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেন, উপাসনামূলক সিজদা প্রত্যেক পয়গাম্বরের শরী‘আতেই আল্লাহ ছাড়া কারো জন্যই বৈধ ছিল না। কিন্তু তা‘জীমী বা সম্মানসূচক সিজদা পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের শরীয়তে বৈধ ছিল। সেই হিসেবে এটা তাঁর জন্য সম্মানসূচক সিজদাও হতে পারে। তবে শিরকের সিঁড়ি হওয়ার কারণে ইসলামী শরী‘আতে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

এরপর ইউসুফ আ. পিতা-মাতার সামনে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

এখানে এটা অনুধাবনযোগ্য যে, যতটুকু দুঃখ-কষ্ট হযরত ইউসুফ আ. এর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, ততটুকু দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন যদি কেউ হয় এবং দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যর পর পিতা-মাতার সাথে মিলন ঘটে, তাহলে সে পিতা-মাতার সামনে নিজের কাহিনী কীভাবে বর্ণনা করবে, আর কতটুকু কাঁদবে এবং কাঁদাবে-তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু এখানে উভয়পক্ষেই আছেন আল্লাহ পাকের পয়গাম্বর ও রাসূল। তাঁদের কার্যপদ্ধতি অনুপম আদর্শে ভাস্বর। তাই তো ইয়াকূব আ. এর দীর্ঘ বিরহী প্রিয় ছেলে হাজারো দুঃখে কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন পিতার সাথে মিলিত হলেন, তখন তিনি বললেন, “আল্লাহ তা‘আলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদের সবাইকে গ্রাম থেকে মিসরে নিয়ে এসেছেন শয়তান

আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়ার পর।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ১০০)

হযরত ইউসুফ আ. এর দুঃখ-কষ্ট যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিলঃ (এক) ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন এর দুঃখ-কষ্ট। (দুই) পিতা-মাতার কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ এর দুঃখ-কষ্ট। এবং (তিন) কারাগারের কষ্ট। আল্লাহ তা‘আলার এ বিশিষ্ট পয়গাম্বর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার প্রসঙ্গ থেকে কথা শুরু করেছেন।

কিন্তু এতেও কারাগারে প্রবেশ করা এবং সেখানকার কষ্ট ক্লেশের বর্ণনা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। বরং জেলখানা থেকে অব্যাহতির কথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসহ বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা অনায়াসে ফুটে উঠেছে যে, তিনি কারাগারে ছিলেন এবং মুক্তি পেয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছেন।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ আ. কারাগার থেকে বের হওয়ার কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভ্রাতারা যে তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তা এদিক দিয়েও উল্লেখ কারেননি যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে ঐ কূপ থেকে বের করেছেন। কেননা, ভাইদের অপরাধ তো পূর্বেই মাফ করে দিয়েছেন এবং বলেছিলেনঃ “আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।” তাই কোনভাবে কূপের কথা উল্লেখ করে ভাইদের লজ্জা দেয়া সমীচীন মনে করেননি।

এরপর ছিল পিতা-মাতা থেকে সুর্দীঘ বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়াদি বর্ণনা করার বিষয়। তিনি এসব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি ও পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতের কথা আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ আপনাদেরকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে দিয়েছেন।

এখানে এই নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইয়াকূব আ. এর বাসভূমি ছিল গ্রামে, সেখানে জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা কম ছিল। আল্লাহ জাল্লাশানুহু তাঁকে শহরে রাজকীয় সম্মানের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন।

এখন শুধু প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট রইল অর্থাৎ ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন প্রসঙ্গ। একে ও শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, আমার ভ্রাতারা এরূপ ছিল না, কিন্তু মাল‘উন শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে কলহ সৃষ্টির এ কাজটি করিয়েছে।

এ হচ্ছে নবুওয়াতের শান! নবীগণ দুঃখ-কষ্টে শুধু সবর-ই করেন না, বরং সর্বক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিক প্রতিফলিত করেন। এ জন্যই তাদের এমন কোন অবস্থা নেই, যেখানে তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি শোকরগুযার নন। অথচ সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা এর বিপরীত হয়। তারা আল্লাহ তা‘আলার নিয়ামতরাজি পেয়েও সেই নিয়ামতের কথা উল্লেখ করতে চায় না, কিন্তু কোন সময় সামান্য কষ্ট

পেলে, জীবনভর তা গেয়ে বেড়ায়। কুরআন পাকে এ বিষয়ের প্রতি অভিযোগ করে বলা হয়েছে-

“নিশ্চয়ই মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।” (সূরাহ আদিয়াত, আয়াতঃ৬)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- “আমার খুব কমসংখ্যক বান্দাই আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে।”

অতঃপর পিতা-মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন ইউসুফ আ. এর জীবনে শান্তি এলো, তখন তিনি সরাসরি আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দু‘আয় মশগুল হয়ে গেলেন। তিনি বললেন-

“নিশ্চয় আমার রব যা চান, তা নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। হে পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের তা‘বীর শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! আপনিই আমার অভিভাবক ইহকাল ও পরকালে। আপনি আমাকে মুসলিমরূপে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে বিশিষ্ট নেককার বান্দাদের মধ্যে শামিল করুন।” (সূরাহ ইউসুফ, আয়াতঃ১০০-১০১)

হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনায় একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে তাঁর পিতা আল্লাহর নবী ইয়াকূব আ. তাঁর বিরহব্যথায় অশ্রু বিসর্জন করতে করতে অন্ধ হয়ে গেলেন এবং অপরদিকে ইউসুফ আ. স্বয়ং নবী ও রাসূল পিতার প্রতি স্বভাবগত মুহাব্বত ও ভালবাসা ব্যাতীত তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও পেরেশান পিতাকে কোন উপায়ে স্বীয় কুশল-সংবাদ পৌঁছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ তখনও অসম্ভব কোন বিষয় ছিল না, যখন তিনি গোলাম হয়ে মিসরে পৌঁছলেন। আযীযে মিসরের গৃহে তাঁর সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারো মাধ্যমে পত্র অথবা খবর পৌঁছিয়ে দেয়া তাঁর পক্ষে তেমন কঠিন কোন ব্যাপার ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক-সেদিক পৌঁছানো যায়, তা সবারই জানা। তারপর বিশেষ করে আল্লাহ তা‘আলা যখন তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে আসে, তখনও নিজে গিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হওয়াটাই তাঁর সর্বপ্রথম কাজ ছিল। এটা কোন কারণে অসমীচীন হলে, কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেয়া ছিল তাঁর জন্যে নেহায়েত মামুলী ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহর পয়গাম্বর ইউসুফ আ. এরূপ ইচ্ছা করেছিলেন বলেও কোথাও বর্ণিত নেই। নিজে ইচ্ছা করা তো দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেয়ার জন্যে ভ্রাতারা প্রথমবার আগমন করল, তখনও আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন। অতঃপর তারা দ্বিতীয়বার আগমন করলে, তখনও আসল ঘটনা বর্ণনা না করে উল্টো বিনয়ামীনকে আটক রাখলেন।

এমত অবস্থা কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। অথচ আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পয়গাম্বর হয়ে তিনি তা কিরূপে বরদাশত করলেন?

এর জওয়াব হচ্ছে-ঘটনার পরম্পরায় এ কথা স্বাভাবিকভাবেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ পাক বিশেষ হিকমত ও রহস্যের অধীনে হযরত ইউসুফ আ. কে এসব প্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। তাফসীরে কুরতুবীতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ আ. কে নিজের সম্পর্কে কোন সংবাদ গৃহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

বিশ্ব পালনকর্তার প্রকৃত রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা উপলব্ধি করা অসম্ভব। তবে মাঝে মাঝে কোন বিষয় কারো বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যত ইয়াকূব আ. এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এজন্যই ঘটনার শুরুতে যখন ইয়াকূব আ. বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসুফ আ. কে বাঘে খায়নি, বরং এটা তার ভাইদের কারসাজি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌছে সরেজমীনে তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য ছিল কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর দিলকে এদিকে যেতে দেননি। অতঃপর হঠাৎ করে দীর্ঘদিন পর তিনি নিজ ছেলেদেরকে বললেনঃ তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে দেন। সুতরাং ঘটনার পূর্বাপর সবই মহান আল্লাহর হুকুমে তাঁরই কুদরতের রহস্য বাস্তবায়নের জন্য হয়েছে বলে বিশ্বাস করতে হবে।

সূরাহ ইউসুফের সর্বশেষ আয়াতে আলোচিত কাহিনী সম্পর্কে পরিশিষ্টরুপে ইরশাদ হয়েছে।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

"তাদের (পয়গাম্বরগণের) কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশের উপাদান রয়েছে। এ কুরআন কোন মনগড়া গ্রন্থ নয়, বরং তা পূর্বেকার গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত ঈমানদারদের জন্য।" (সূরাহ ইউসুফ, আয়াত:১১১)

উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উল্লেখিত পয়গম্বরগণের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশের উপাদান রয়েছে। এর দ্বারা সব পয়গাম্বরের কাহিনীও উদ্দেশ্য হতে পারে অথবা বিশেষ করে ইউসুফ আ. এর কাহিনী ও উদ্দেশ্য হতে পারে যা-অত্র সূরায় এ যাবত বর্ণিত হয়েছে।

এখানে উপদেশের উপাদান বিশেষত এই যে, আলোচিত ঘটনায় এ বিষয়টি পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে কিভাবে সাহায্য ও সহযোগীতা করেন এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে বসান আর অপবাদ

থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চ মর্তবার শিখরে কিভাবে পৌছে দেন। পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীদেরকে পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন করেন।

উল্লেখিত আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে যে, এ কাহিনী কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের সমর্থনকারী। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে-তাওরাত ও ইনজীলেও কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যেমন বর্ণিত হয়েছে কুরআনে। এ সম্পর্কে হযরত ওয়াহহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন, "পৃথিবীতে যতগুলো আসমানী কিতাব ও সহীফা নাযিল হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই ইউসুফ আ. এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।" (তাফসীরে মাজহারী)

শাইখ আবু মানসূর রহ. বলেন, সম্পূর্ণ সূরাহ ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে-রাসূল কারীম ﷺ-কে তাসাল্লী ও সান্ত্বনা প্রদান করা যে, কাফিরদের হাতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করেছেন, পূর্ববর্তী নবীগনও আ. তদ্রূপ কষ্ট ভোগ করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক বেদ্বীনদের মুকাবিলায় পয়গাম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটি ও সেইরূপই হবে।

আলোচিত কহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা ও জীবন কাহিনী থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ হচ্ছে-

(এক) ইউসুফ আ. এর ভ্রাতারা যখন অক্ষত অবস্থায় তাঁর জামা পিতার কাছে নিয়ে এসেছিল, তখন হযরত ইয়াকূব আ. ইউসুফ আ.-এর জামা অক্ষত থাকার দ্বারা নিজ ছেলেদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, বিচারকের জন্য উচিত উভয় পক্ষের দাবী-দাওয়া ও যুক্তি-প্রমাণের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আলামতের প্রতিও লক্ষ্য রেখে বিচার করা।

(দুই) যুলাইখা যখন একটি নির্জন কক্ষে ইউসুফ আ. কে স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুঁসলাতে শুরু করেছিল, তখন ইউসুফ আ. সঙ্গে সঙ্গে যেখান থেকে দৌড়ে বের হয়ে পড়েছিলেন। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, যে স্থানে গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে স্থানকেই পরিত্যাগ করা উচিত। আর এক্ষেত্রে নিজের সম্ভাব্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে- যেমনটি হযরত ইউসুফ আ. করেছিলেন।

(তিন) আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম পালনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য-যদিও বাহ্যত এর ফলাফল দেখা না যায়। ফলাফল তো আল্লাহর হাতে। বান্দার কাজ হল-স্বীয় চেষ্টা-সাধনাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে দাসত্বের পরিচয় দেয়া। যেমন, ইউসুফ আ. সব দরজা বন্ধ থাকা সত্বেও এবং ঐতিহাসিক রিওয়ায়াত অনুযায়ী তালাবদ্ধ থাকা সত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করেছেন।

এহেন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে গায়েবী সাহায্যের আগমনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়।

বস্তুত বান্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সাফল্যের পথ উন্মুক্ত করে দেন। যেমন দিয়েছেন হযরত ইউসুফ আ. এর ক্ষেত্রে। সমস্ত দরজা কুদরতীভাবে খুলে দিয়ে তাকে বের হওয়ার পথ তৈরী করে দিয়েছেন।

(চার) কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, ইউসুফ আ. যখন জেলে প্রেরিত হন, তখন আল্লাহর তরফ থেকে ওহী আসে-আপনি নিজেকে জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন- "হে আমার পালনকর্তা এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান করছে এর চাইতে জেলখানা আমার নিকট অধিক পছন্দ।" তখন আপনি জেলখানা পছন্দ করা ছাড়া অন্যকোন নিরাপত্তা চাইলে, আপনাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো।

এ থেকে বুঝা গেল যে, বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে দু'আয় সেই বিপদের তুলনায় অমুক ছোট বিপদকে আমি ভাল মনে করি এরূপ বলা সমীচিন নয়। বরং ছোট বড় প্রত্যেক বিপদাপদ ও মুসীবত থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে পরিপূর্ণ মুক্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

(পাঁচ) আলোচিত কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেলখানায় দু'জন কয়েদী যখন হযরত ইউসুফ আ. এর কাছে স্বপ্নের তা'বীর জিজ্ঞেস করেছিল, তখন তিনি তাদের স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা করার পূর্বে ঈমান আমল ও তাওহীদের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে তাদের কাছে দ্বীনী দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এ থেকে বুঝা গেল যে, কোন মুসলমানের কাছে কেউ কোন বিষয় নিয়ে উপস্থিত হলে এবং সে দ্বীন থেকে গাফিল থাকলে, প্রথমে তার নিকট ঈমান আমল সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে তাকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া কর্তব্য। অতঃপর তার উক্ত বিষয় সমাধা করে দেয়া উচিত।

(ছয়) হযরত ইউসুফ আ. বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার পর তাকে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ সময় যখন এ জরুরতের তাকাজা এসেছিল যে, এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে? তখন ইউসুফ আ. উত্তর দিয়েছিলেন "জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আপনি আমাকে নিযুক্ত করুন।

আয়াতের এ অংশ থেকে বুঝা যায় যে, যদিও নিজের জন্য কোন পদ প্রার্থনা করা সাধারণভাবে নিষেধ, কিন্তু যদি কখনো এমন পর্যায়ে আসে যে, তার জানা থাকে যে, সুষ্ঠুভাবে অপর কেউ সেই কাজ আনজাম দিতে পারবে না, সেই অবস্থায় সেই কাজ আনজাম দানের জন্য বা দেশ ও জাতির নিরঙ্কুশ সেবার জন্য নিজেকে পেশ করতে পারে।

তেমনিভাবে কোন বিশেষ পদ সম্বন্ধে যদি জানা যায় যে, অন্য কোন ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না এবং নিজে ভালরূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে এবং তার মধ্যে কোন গুণাহে লিপ্ত হওয়ারও আশংকা না থাকে, তাহলে দেশ ও জনগণের বৃহৎ কল্যাণের জন্য তার পক্ষে উক্ত পদের প্রার্থী হওয়া জায়িয।

তবে শর্ত এই যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-কড়ির মোহে নয়, বরং উক্ত পদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের খিদমত ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং তা সেভাবেই আনজাম দিতে হবে, যেমন হযরত ইউসুফ আ. এর দ্বারা হয়েছিল। আর যেখানে এরূপ অবস্থা না হয়, সেক্ষেত্রে রাসূলে কারীম ﷺ কোন পদ প্রার্থনা করতে বা প্রার্থী হতে নিষেধ করেছেন। বরং যদি কেউ কোন পদের জন্য আবেদন করেছে, তিনি তাকে সেই পদ দেননি।

(সাত) হযরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা যদি এমন চরমে পৌছে যে, সরকার কোন ব্যবস্থা না নিলে অনেক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তখন সরকার এ ধরনের দ্রব্যসামগ্রীকে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্যশস্যের উপযুক্ত মূল্যও নির্ধারণ করে দিতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া সরকারের জন্য ঠিক নয়।

অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সিন্ডিকেট করে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে অধিক মুনাফা লুটতে থাকে, সরকার তাকে বা তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করবে এবং বাজারে দ্রব্যের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(আট) ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা যখন দ্বিতীয়বার মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন, তখন ইয়াকূব আ. তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ করার ব্যাপারে একটি বিশেষ উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর প্রাচীরের কাছে গিয়ে আলাদা হয়ে যেয়ো এবং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। কারণ এতে করে কারো কুদৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা আছে। এ দ্বারা জানা গেল যে, বদ নজর লাগা সত্য ও বাস্তব বিষয়। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার ন্যায় এবং এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে তদবীর করার ন্যায় এ বদনজর থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এর কুপ্রভাব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এর কুপ্রভাব থেকে মুক্তির জন্য তদবীর করাও সমভাবে শরীয়তসিদ্ধ।

(নয়) এ থেকে আরও বুঝা গেল যে, যদি কেউ অন্য কারো সম্পর্কে দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার আশঙ্কা পোষণ করে, তবে তাকে সে ব্যাপারে অবহিত করা এবং দুঃখ-

কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বলে দেয়া উচিত, যেমন ইয়াকূব আ. ইউসুফ ভ্রাতাদের ব্যাপারে করেছিলেন।

(দশ) হযরত ইয়াকূব আ. নিজ ছেলেদেরকে কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার তদবীর বাতলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছিলেন যে, আমি জানি-এ তাদবীর বাতলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছিলেন যে, আমি জানি-এ তদবীর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। হুকুম একমাত্র তাঁরই চলে। তবে মানুষের উপর বাহ্যিক চেষ্টা-তাদবীর করার নির্দেশ আছে। তাই এ উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি এ তদবীরের উপর ভরসা করি না, বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করি। অর্থাৎ এ তদবীরের দ্বারা কিছুই হবে না, তবে আল্লাহ যদি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের হেফাযত করেন, তবেই তোমরা হিফাযতে থাকতে পারবে।

হযরত ইয়াকুব আ. এর এ বক্তব্যে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে-প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহ পাকের উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়াদিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করবে। ইয়াকূব আ. তা-ই করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ শিক্ষাই দিয়েছিলেন।

(এগার) আলোচিত ঘটনায় হযরত ইয়াকুব আ. এর অবস্থা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান-মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোন মুসীবত ও দুঃখ কষ্ট দেখা দিলে, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে-সবর ইখতিয়ার করে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং ইয়াকূব আ. ও অন্যান্য পয়গাম্বরের আ. অনুসরণ করা।

(বার) আলোচ্য কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ আ.- কে যখন তাঁর ভাইয়েরা চিনে ফেলল, তখন তারা অতিরিক্ত কিছু তথ্য জানার জন্য তাকে প্রশ্ন করল- "সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ?" উত্তরে ইউসুফ আ. বললেন "হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ আর এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই।" অতঃপর তিনি আরও বললেন- "আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। নিশ্চয় যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ পাক এহেন সৎকর্মীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল যে, হযরত ইউসুফ আ. হাজারো দুঃখ

কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন ভাইদের সাথে পরিচিত হলেন, তখন পূর্ববর্তী কোন বিপদাপদের কথাই তিনি উল্লেখ করলেন না বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতসমূহের কথাই শুধু স্মরণ করলেন এবং উল্লেখ করলেন।

এ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ যখন কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়, এরপর আল্লাহ পাক যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, তখন তার উচিত-অতীত বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা। কেননা, বিপদ থেকে মুক্তি ও খোদায়ী নিয়ামত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ-কষ্টের কথা মনে করে হা-হুতাশ করা অকৃতজ্ঞতারই

পরিচায়ক। কুরআন মাজীদের সূরাহ ‘আদিয়াত-এ এ ধরনের অকৃতজ্ঞতাকে কানূদ كنود

বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কানূদ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে নিয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ না করে শুধু কষ্ট ও বিপদাপদের কথাই স্মরণ করে।

পরিশেষে আমাদের কর্তব্য-পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবী-রাসূলগণের কাহিনী ও ঘটনা আমাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে আমাদের জীবনের ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে নেয়া এবং নবীগণের আদর্শ গ্রহণ করে জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করা। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে নবী-রাসূলগণের ঘটনা আমাদের নিকট এজন্যই উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে আলোচিত ঘটনা থেকে শিক্ষা হাসিল করে সর্বপ্রকার চক্রান্ত ও প্রতারণামূলক কার্যকলাপ থেকে দূরে থেকে নবীওয়ালা আদর্শিক চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

সমাপ্ত